হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মদিনা জীবন

ইউনিট ৪

ভূমিকা

হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় আগমনের পর তাঁর মাদানী জীবন শুরু হয়। তাঁর জীবনের এ অধ্যায় খুবই ঘটনাবহুল। মক্কায় থাকাকালীন সময়ে তিনি শুধু ধর্মপ্রচারকের ভূমিকায় ছিলেন। আর মদিনায় এসে তিনি রাষ্ট্রনায়কের মর্যাদা লাভ করেন। ফলে ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠার সুযোগ পান। ইসলামের সামাজিক ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময়ে তিনি একাধারে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সামাজিক সংস্কার, অর্থনৈতিক নীতি-নির্ধারণ, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও নতুন সভ্যতার গোড়াপত্তন করেন। সাথে সাথে ধর্মীয় অনুশাসন প্রতিষ্ঠায় যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর জীবনের মাত্র দশ বছর মদিনায় অবস্থান করেছিলেন। এ সময়েই ইসলামের অধিকাংশ বিধান অবতীর্ণ হয়। ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে তাঁকে অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। ইসলাম বিরোধী শক্তির সাথে অনেকগুলো সশস্ত্র যুদ্ধ করতে হয়েছে। তিনি ইসলামী আদর্শকে আরবের সমিান অতিক্রম করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জাতির কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। খুব কম সময়ের মধ্যে তিন বিশ্ব মানবতার কাছে একটি চিরন্তন কালজয়ী জীবনব্যবস্থা ও আদর্শ সমাজ কাঠামো উপহার দেন, যা ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। তাঁর জীবনের বিস্ময়কর সফলতা এখানেই।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৪.১ঃ মদীনায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রাথমিক কার্যাবলী
পাঠ ৪.২ঃ মদীনা সনদের গুরুত্ব
পাঠ ৪.৩ঃ বদর যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল
পাঠ ৪.৪ঃ উহুদ যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল
পাঠ ৪.৫ঃ খন্দকের যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল
পাঠ ৪.৬ঃ হুদাইবিয়ার সন্ধি
পাঠ ৪.৭ঃ মক্কা বিজয়
পাঠ ৪.৮ঃ হুনায়নের যুদ্ধ
পাঠ ৪.৯ঃ মুতার যুদ্ধ ও তাবুক অভিযান
পাঠ ৪.১০ঃ ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সম্পর্ক
পাঠ ৪.১১ঃ বিদায় হজ্জের ভাষণ ও মুহাম্মদ (সা.) এর শেষ জীবন

পাঠ-৪.১ মদীনায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রাথমিক কার্যাবলী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মহানবী (সা.) এর মদীনা জীবনে প্রাথমিক কার্যাবলী সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- মদীনায় বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠির পরিচয় জানতে পারবেন এবং
- মুহাজির ও আনসারদের পরিচয় সম্পর্কে সাম্যক ধারণা লাভ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**ইয়াসরিব, ইহুদী, মুনাফিক, পৌত্তলিক ও 'আসহাবুস-সুফফা'**

মদিনা জীবনের প্রাথমিক কার্যাবলী

৬২২ সালের পূর্বে ইয়াসরেব নামক জনৈক আমালেকা নরপতি এ নগরী প্রতিষ্ঠা করে একে রাজধানী মনোনীত করেন। তাঁর নামানুসারে এ শহর ইয়াসরেব নামে অভিহিত হতে থাকে। মক্কা থেকে প্রায় আড়াইশ মাইল উত্তরে এ নগরী অবস্থিত। হিজরতের পর মহানবী (সা.)-এর সম্মানে ইয়াসরিববাসী এর নাম পরিবর্তন করে 'মদিনাতুন্-নবী' বা নবীর শহর' সংক্ষেপে মদিনা রাখেন।

মুহাজির ও আনসার ঃ মদিনায় হিজরতের পর মহানবী (সা.)-এর সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দেয় মুহাজিরদের পুনর্বাসন নিয়ে। যেসব সাহাবী জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে হযরতের সঙ্গে মদিনায় চলে এসেছিলেন তাঁদেরকে 'মুহাজিরীন' বলা হয়। মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাঁদের অপরিসীম ভক্তি, শ্রদ্ধা ছিল। তাঁরা ইসলামের জন্য নিজেদের ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন, বিষয়-সম্পদ সব কিছু ছেড়ে এসে নিঃস্ব অবস্থায় মদিনায় আশ্রয় নেন। প্রিয় নবী (সা.) তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। প্রথমত: মদিনাবাসী আনসারদের সাথে মক্কার মুহাজিরদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেন। দ্বিতীয়ত: আনসারগণ মুহাজিরদেরকে ভাই বলে গ্রহণ করেন এবং নিজেদের ধন-সম্পদে মুহাজির ভাইকে অংশ দেন।

মদিনাবাসী মুসলিমগণ মক্কা থেকে আগত উদ্বাস্তু মুহাজিরীন ভাইদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, দুঃখ দুর্দশায় সাহায্য করেছিলেন এবং মহানবী (সা.)-কে সকল অবস্থায় সাহায্য করেছিলেন। এজন্য তাঁদেরকে 'আনসার' (helpers) বা 'সাহায্যকারী' বলা হয়। এ আনসারদের সহায়তা না পেলে ইসলাম মদিনায় এবং সারা বিশ্বে হয়ত প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারত না। ধর্মভাইদের প্রতি এরূপ আত্মত্যাগ পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও দেখা যায় না।

মসজিদ নির্মাণ ঃ মহানবী (সা.) বনু নাজ্জার গোত্রের সাহল ও সুহাইল দু'জন ইয়াতিম বালকের এক খণ্ড জমি ক্রয় করে মসজিদ নির্মাণ করেন। হযরত নিজেও নির্মাণ কার্যে অন্যান্যদের সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করেন। মসজিদের দেয়াল তৈরি হয়েছিল ইট ও মাটি দিয়ে এবং ছাউনি দেয়া হয়েছিল খেজুর পাতার। এটাই 'মসজিদুন্নবী' বা নবীর মসজিদ। এখানে বসেই মহানবী (সা.) ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রয়ী সকল কাজ করতেন। কালক্রমে এটাই ইসলামের প্রধান মিলনকেন্দ্র হিসেবে পরিণত হয়। এ মসজিদের সাথেই তাঁর পরিবারবর্গের বাসস্থান নির্মাণ করা হয়। সাহাবীদের মধ্যে এদেরকে 'আসহাবুস-সুফফা' বা 'চত্তরবাসী' হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো। যাদের ঘরবাড়ি ছিল না তাদের বসবাসের জন্য মসজিদের একাংশ আলাদা করা হয়েছিল। আর এ মসজিদই পরবর্তীকালের মুসলিমদের জন্য মসজিদস্থাপনা তৈরীর অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

মদিনায় বিভিন্ন দল ও গোত্রের অবস্থা ঃ মুহাজির ও আনসার ছাড়াও মদিনায় বিভিন্ন শ্রেণির লোক বাস করতো। মদিনায় আদি অধিবাসী আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় পরস্পর ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত ছিল। এদের দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে মদিনার ইহুদিরা নিজেদের স্বার্থের জন্য তাদেরকে শোষণ করতো। ইহুদিদের তিনটি শাখা ছিল। যথা- বনু কুরাইযা, বনু নাযির ও বনু কাইনুকা। বনু করাইযা ও বনু নাযীর আউস গোত্রের পক্ষে এবং বনু কাইনুকা ছিল খাযরাজ গোত্রের পক্ষে। ইহুদিদের কূটনৈতিক শত্রুতার ফলে 'বুয়াসের' ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের ফলে উভয় গোত্রের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে।

তারা একজন ভালো নেতার সন্ধানে ব্যাস্ত ছিল। তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে একজন উত্তম নেতা হিসেবে পেয়ে সাদরে গ্রহণ করেন।

আদি পৌত্তলিক ঃ মদিনার আদি অধিবাসীদের মধ্যে একদল মূর্তি উপাসক পৌত্তলিকও ছিল। মহানবী (সা.)-এর আগমনে তারাও প্রথমে খুশি হয়েছিল এবং তাঁকে রক্ষা করার জন্য সংঘবদ্ধ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ইসলামের শক্তির একক উত্থান ও বিকাশে পৌত্তলিকরা ঈর্ষাকাতর হয়ে উঠেছিল। তবে এরা সময়ের ব্যবধানে ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পরে ইসলামের পতাকা তলে সমবেত হয়েছিল।

ইহুদি ঃ মদিনার ইহুদিরা ছিল শক্তিশালী এবং স্বার্থান্ধ। তারা প্রথমে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মদিনা আগমনকে স্বাগত জানানোর জন্য মদিনাবাসীদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। রাসূল (সা.) প্রথমে আসমানী ধর্ম হিসেবে তাদের ধর্মের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি স্থাপন করার জন্য তাদের কিছু রীতিনীতি গ্রহণ করেছিলেন। ইহুদিরা প্রথমে মনে করেছিল, তারা হযরতকে দলভুক্ত করতে পারবে। কিন্তু ইহুদিরা ছিল অভিশপ্ত জাতি এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে সীমাহীন দুর্বৃত্ত। হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে সর্বশেষ বিশ্বনবী তা তারা ভালো করে জানত। তবুও চরম স্বার্থান্ধতার পরিচয় দিয়ে তারা রাসূল (সা.) ও ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগল। ইহুদিদের মধ্যে তিনটি শাখা ছিল। যথা- বনু কুরাইযা, বনু নাযীর ও বনু কাইনুকা। এরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের ব্যবসায় চালিয়ে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল।

খ্রিস্টান ঃ খ্রিস্টানরা বসবাস করতো নাজরান অঞ্চলে। এদের ধর্মও বিকৃত ছিল। তবুও এরা ইহুদিদের মতো ততটা নিকৃষ্ট মানসিকতার ছিল না। মদিনার খ্রিস্টানগণও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মদিনায় আগমনকে অন্যান্যদের সাথে স্বাগত জানায়। কিন্তু তারাও পরবর্তী সময়ে রাসূলের বিরোধিতা করে।

মুনাফিক গোষ্ঠী ঃ রাসূলের মদিনায় আগমনের পর আরো একটি নতুন উপদল সৃষ্টি হলো। এরা সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এদের নেতা ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। হযরতের আগমনের পূর্বে সে মদিনার রাজ-ক্ষমতা লাভের জন্য লালায়িত ছিল। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মদিনায় আসার কারণে তার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এ মর্মজ্বালায় সে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও ইসলামের সাথে গোপন শত্রুতা শুরু করে। তার সাথে আরো অনেকে মিলিত হয়। এরা স্বার্থ হাসিল ও জনপ্রিয়তা লাভের আশায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু গোপনে এরা ইসলামের ভীষণ শত্রু ছিল। ইসলামের ধংসের জন্য এরা নানা ষড়যন্ত্রমূলক কাজ করতে থাকে। এদেরকে 'মুনাফিক' বলা হয়। এ শ্রেণির লোকগুলো প্রকাশ্য শত্রুর চেয়ে অধিকতর ভয়ানক ছিল। এরা কাফিরদের চেয়েও নিকৃষ্টতর।

বিভিন্ন বিধান প্রবর্তন ঃ দ্বিতীয় হিজরিতে রমযানের সাওম ফরয করা হয়। ঐ বছর ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফিতরের মহোৎসবও প্রবর্তিত হয়। দরিদ্র মুসলিমদের সাহায্য দানের জন্য এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো শক্তিশালী করার জন্য যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। যাকাত প্রদান করা সাহেবে নেসাব ধনী মুসলিমদের জন্য ফরয বলে ঘোষিত হয়। এভাবে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারাদি প্রবর্তনে যাকাত ব্যবস্থা চালু করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	**মদীনার জনগোষ্ঠির পরিচয় বিশ্লেষণ করুন।**

আদি পৌত্তলিকরা কার ইবাদাত করত?	মদীনার ইহুদিদের প্রধান তিনটি শাখার নাম কী কী?	আনসার কারা?	মুনাফিকরা কাদের চেয়েও নিকৃষ্ট?

সারসংক্ষেপ :

মহানবী (সা.) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পর স্থানীয় জনগণ তাকে সাদর আমন্ত্রণ জানায়। মুহাজির ও আনসারগণ তাকে অনুসরণ করে। ইহুদিরা প্রথমদিকে মেনে নিলেও পরে ষড়যন্ত্র শুরু করে। মহানবী (সা.) মদীনার সকল জনগোষ্ঠির মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তিনি মদিনা মসজিদ নির্মাণ ও মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা এবং অ মুসলিমদের জন্য সনদ প্রণয়নের মাধ্য আন্ত:ধর্মীয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মহানবী (সা.) কত খ্রিস্টাব্দে মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করেন?
(ক) ৬১৯ (খ) ৬২০
(গ) ৬২১ (ঘ) ৬২২

২। মহানবী (সা.)-এর মদিনা জীবনের ব্যাপ্তি ছিল-
i. ৬২২-৬৩০ ii. ৬২-৬৩১ iii. ৬২২-৬৩২
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ও ii

৩। কত হিজরীতে রমজানের রোজা ফরজ হয়-
(ক) তৃতীয় (খ) দ্বিতীয়
(গ) প্রথম (ঘ) পঞ্চম

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

আফ্রিকায় এক জালিম রাজা ছিল। কেউ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস পেত না। এক সময় সেখানে এক মহৎপ্রাণ ব্যাক্তির আবির্ভাব ঘটে। তিনি জনগনকে সাথে নিয়ে উক্ত জালিম রাজার সকল অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শুরু করেন। এতে রাজা ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের হত্যার আদেশ দেয়। ফলে বাধ্য হয়ে তিনি পার্শ্ববর্তী রাজ্যে গমন করেন। সে রাজ্যের জনগন তাকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করে। তিনি তার সকল বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে সে রাজ্যকে একটি সমৃদ্ধশালী ও প্রজাহিতৈষী রাজ্যে পরিণত করেন।

(ক) মদীনার পূর্ব নাম কী? ১
(খ) মুনাফিকদের পরিচয় দিন। ২
(গ) উদ্দীপকের আলোকে মদীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পটভূমি আলোচনা করুন। ৩
(ঘ) 'ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের প্রকৃষ্ট উদাহরণই হচ্ছে আনসার ও মুহাজিরদের সম্পর্ক' - উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৪.২ মদীনা সনদ এবং এর গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রথম লিখিত সংবিধান হিসেবে মদীনা সনদের শর্তাবলী জানতে পারবেন;
- মদীনা সনদের ঐতিহাসিক গুরুত্ত্ব উপলব্দি করতে পারবেন ও
- মদীনার বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**মদীনা সনদ, আনসার, মুহাজির, আউস, খাজরাজ ও ইসলামিক ভ্রাতৃত্ববোধ**

মদিনা সনদ

মহানবী (সা.) প্রিয় জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করার পর সেখানে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র স্থাপন করার পরিকল্পনা করেন। মহানবী (সা.) মদিনার সংহতির চিন্তা করে সেখানকার অধিবাসীদের নিয়ে তথা পৌত্তলিক, ইহুদি, খ্রিস্টান এবং মুসলিমদের মধ্যে এক লিখিত সনদ বা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। আর এ সনদের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার ঘোষণা দেন। এ সনদকেই 'মদিনা সনদ' বলা হয়। ইসলামের ইতিহাসে এ সনদের গুরুত্ব 'লীগ অব নেশন্স', বা 'জাতিসংঘ', 'চার্টার অব হিউম্যান রাইটস' বা জেনেভা কনভেনশনের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী ছিল। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক। তিনি তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার দ্বারা অবলোকন করলেন যে, মদিনা ও পাশবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী ইহুদি, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক ও মুসলিমদের মধ্যে সহাবস্থান এবং সম্প্রীতি স্থাপিত না হলে একটি সুসংহত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই তিনি এ চার জাতির লোক নিয়ে একটি 'আন্তর্জাতিক সনদ' রচনা করেন। এ সনদের ৪৭ টি ধারা ছিল। এ সনদকেই 'মদিনা সনদ' বা æ**The Charter of Madina**' বলা হয়।

মদিনা সনদের ধারা বা শর্তসমূহ

আবু ওবাইদ তার *'কিতাব আল আমওয়াল'* নামক গ্রন্থে বলেন: সামাজিক নিরাপত্তা, বিচারব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা, কেন্দ্রীয় প্রশাসনের বিভিন্ন বিষয় এবং বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ ক্ষমতা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর ন্যস্ত করা হয়। এ সনদ বলে হযরত মুহাম্মদ (সা.) মদিনার সর্বাধিনায়ক ছিলেন। মদিনা সনদের প্রধান ধারাসমূহ নিম্নরূপ-

১. মদিনা সনদে স্বাক্ষরকারী ইহুদি, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক ও মুসলিমগণ মদিনা রাষ্ট্রে সমান নাগরকি অধিকার ভোগ করবে এবং একটি জাতি (উম্মাহ) গঠন করবে।
২. সনদ অনুযায়ী মহানবী (সা.) মদিনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং মদিনার সর্বোচ্চ বিচারলয়ের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হবেন।
৩. মদিনা রাষ্ট্রের পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় থাকবে। সকল শ্রেণির লোক নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারবে।
৪. মদিনা সনদে স্বাক্ষরকারী কোনো পক্ষ মদিনার জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোনো ঘৃণ্য পক্ষে যোগ দিবে না।
৫. সনদে স্বাক্ষরকারী কোনো সম্প্রদায়কে বহিঃশত্রু আক্রমণ করলে সম্প্রদায়ের সমবেত শক্তির সাহায্যে সে বহিঃশত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।
৬. সনদে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়সমূহ বহিঃশত্রুর হামলার সময় স্ব স্ব সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করবে।
৭. সনদে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তি অপরাধ করলে তা ব্যক্তিগত অপরাধ বলে গণ্য করা হবে। এজন্য অপরাধীর সম্প্রদায়কে দোষী করা চলবে না।
৮. মদিনাকে পবিত্র বলে ঘোষণা করা হলো এবং রক্তপাত, হত্যা, বলাৎকারসহ অপরাপর অপরাধমূলক কার্যকলাপ চিরতরে নিষিদ্ধ করা হলো।
৯. অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং সর্বপ্রকার পাপী ও অপরাধীকে ঘৃণার চোখে দেখতে হবে।
১০. স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়ের কারো মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলে মহানবী (সা.) আল্লাহর বিধানানুযায়ী তার মীমাংসা করবেন।
১১. দুর্বল ও অসহায়কে সর্বোতভাবে সাহায্য ও রক্ষা করতে হবে।

১২. মহানবী (সা.)-এর পূর্বসম্মতি ব্যতিরেকে মদিনাবাসীগণ কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না।
১৩. সনদে মক্কার কুরাইশগণকে সাধারণভাবে মদিনা রাষ্ট্রের শত্রু বলে ঘোষণা করা হয়। তাদেরকে বা তাদের সাহায্যকারীদেরকে সহায়তা নিষিদ্ধ করা হয়।
১৪. সনদে বলা হয়, প্রত্যেক গোত্র সাধারণভাবে মহানবী (সা.)-এর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব মেনে চলবে। কিন্তু স্ব স্ব গোত্রীয় দলপতিদের গোত্রীয় প্রাধান্যও অক্ষুণ্ন থাকবে। প্রত্যেকটি গোত্র তাদের পূর্ববর্তী চুক্তিসমূহ এবং দেয় মৃত্যুপণ ও মুক্তিপণসমূহ এককভাবে প্রদান করবে। সেখানে মদিনা রাষ্ট্র কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না।
১৫. সনদের শর্ত ভঙ্গকারীর ওপর আল্লাহর অভিসম্পাতের কথা বলা হয়।

মদিনা সনদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

আরবের ইতিহাসে শান্তি প্রতিষ্ঠার সুমহান উদ্দেশ্য নিয়ে অন্য কোনো ব্যক্তি বা নেতা এমন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেননি। শান্তি প্রতিষ্ঠার বাস্তব উদ্যোগের প্রেক্ষিতে মদিনা সনদ বিভিন্ন দিক দিয়ে বহু গুরুত্ব বহন করে। মহানবী (সা.) যে নিছক একজন ধর্মপ্রচারকই নন; বরং বিশ্ব ইতিহাসে একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক বিপ্লবী মহাপুরুষ ছিলেন, তাও এ সনদে প্রমাণিত হয়। উইলিয়াম মুইর যথার্থই বলেন- It reveals the man in his real greatness a mastermind not only of his own age but of all ages. রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক, নৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মদিনা সনদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে তা সবিস্তার আলোচনা করা হলো-

প্রথম লিখিত সংবিধান

দিনায় শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত মদিনা সনদ পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান। এর পূর্বে এরূপ কোনো মৈত্রী সংবিধান ছিল না। এটি তৎকালীন যুগেই নয়; বরং সর্বযুগে সর্বকালের মহামানবের জন্য শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। ঐতিহাসিক মুইর বলে, "এ চুক্তি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অসামান্য মাহাত্ম্য ও অপূর্ব মননশীলতার পরিচায়ক।" ড. হামিদুল্লাহ বলেন, "মোট ৪৭ টি ধারাবিশিষ্ট এ সনদ ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র।"

ভ্রাতৃসংঘ ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা ঃ 'মদিনা সনদ' মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সব সম্প্রদায়কে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে হিংসাদ্বেষ ও কলহের অবসান করে এবং বিপদে সবাই এক- এ নীতিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করে। মুসলিম ও অন্যদের সাথে সকল প্রকার পার্থক্য নিরসনে এর কার্যকারিতা ধারাগুলোর দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়ে যায়।

রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা ঃ সে সময় আরবের মানুষদের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা.) মদিনায় হিজরতের পর জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে রক্তের ভিত্তির স্থলে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে মদিনাবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয়। একমাত্র রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রণীত মদিনা সনদই মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সবার ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ঐক্য প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখে।

ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও উদারতা ঃ হযরত মুহাম্মদ (সা.) ধর্মীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর প্রণীত মদিনা সনদ মুসলিম অ মুসলিম নির্বিশেষে সকলের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। মদিনার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা পরস্পরের ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।"- এ শর্ত দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে মহানুভবতা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন তা বিশ্বের ইতিহাসে সত্যিই বিরল।

মসজিদে নববী নির্মাণ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আগমনের পূর্বে মদিনায় কোনো মসজিদ বা মুসলিমদের সালাত পড়ার সুনির্দিষ্ট কোনো স্থান ছিল না। তিনি মদিনায় আগমনের পর সে স্থানটিই মসজিদের জন্য ক্রয় করে দেন, যেখানে তাঁর উষ্ট্রী বসে পড়েছিল। কাঁচা ইটের প্রাচীর, খেজুর গাছের খুঁটি এবং খেজুর শাখার ছাদ দিয়ে মসজিদ নির্মিত হলো। মসজিদ সংলগ্ন স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রীদের জন্যও কক্ষ তৈরি করা হয়েছিল। এ মসজিদ নির্মাণে সাহাবীগণ কায়িক শ্রম দান করেন, যাতে মহানবী (সা.) নিজেও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ঃ সে কালের মানুষের মধ্যে গণতন্ত্রের কোনো ধারণাই ছিল না। মদিনা সনদ গোত্রপ্রথার বিলোপ সাধন করে ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর সমাজ ও ধর্মীয় অনুশীলন পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করে। ফলে আদর্শ গণতন্ত্রের ভিত প্রোথিত হয়। ঐতিহাসিক পি.কে.হিট্টি বলেন, "মদিনা প্রজাতন্ত্রই পরবর্তীকালে বৃহত্তর ইসলামী সাম্রাজ্যে পরিণত হয়।" স্বৈরাচারী শাসন অথবা শেখতন্ত্রের পরিবর্তে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলামী প্রজাতন্ত্রে স্বীকৃতি লাভ করে। ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিম বলেন, "মদিনা সনদের মাধ্যমে সত্যিকার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজের সকল সদস্য একের প্রতি অন্যের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অবগতি লাভ করে। ফলে তারা একটি নতুন সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।"

ধর্মীয় উদারতা ঃ মদিনা সনদ মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সব মানুষকে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং নির্বিঘ্নে যার যার ধর্ম পালনের নিশ্চিয়তা বিধান করে। মদিনার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা একে অপরের ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না- মহানবী (সা.) এ শর্ত দ্বারা যে মহানুভবতা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন, তা বিশ্বের ইতিহাসে সত্যিই বিরল। সর্বগুণে গুণান্বিত, সর্বশ্রেষ্ঠ যুগান্তকারী এ মহাপুরুষ বিশ্বে ধর্ম ও রাজনীতির সমন্বয়ে যে ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন, উত্তরকালে তা বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের রূপ পরিগ্রহ করে।

প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঃ মহানবী (সা.) তৎকালীন বিশ্বে ধর্ম ও রাজনীতির সমন্বয়ে যে ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন, উত্তরকালে তা বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। পি.কে.হিট্টি যথার্থই বলেছেন, "মদিনা প্রজাতন্ত্রই পরবর্তীকালে বিপুল বিস্তৃত ইসলামী সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল স্থাপন করে।"

মদিনায় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তন

ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ঃ মদিনায় মহানবী (সা.) ধনী ও গরিবের মধ্যে বৈষম্য সীমারেখা ছিন্ন করে সমতা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে এক উন্নত সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। রাসূল (সা.) মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরো সুদৃঢ় করার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি আনসার এবং মুহাজিরদের মধ্যে পারস্পরি বন্ধুত্ব চুক্তি সম্পাদন করলেন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, প্রত্যেক আনসারের একজন করে মুহাজির বন্ধু থাকবে এবং প্রত্যেক মুহাজিরের একজন করে আনসার বন্ধু থাকবে। এরা একে অন্যের তত্ত্বাবধান করবে এবং পরস্পরের সুখ-দুঃখে অংশ নেবে। এভাবে মুসলিমদের জন্য নিবিড় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি হলো।

প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরীর উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি

১. হযরত সালমান ফারেসী ইসলাম গ্রহণ ঃ এ বছর হযরত সালমান ফারেসী এবং ইহুদি ধর্মবিশারদ আবদুল্লাহ ইবনে সালাম মুসলিম হন। এ বছরই হযরত আবু উমামা ও আসাদ ইবনে যোরারা ইন্তেকাল করেন।

২. সালাতের বিধান পরিবর্তন ঃ সালাত নবুয়তের প্রথম দিকেই ফরয হয়েছিল, যা সকাল সন্ধ্যায় দু'রাকাত করে পড়া হতো। মেরাজের মাধ্যমে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হয়। জুমুআ অবশ্য মক্কায় ফরয হয়েছিল, কিন্তু আদায় করার সুযোগ হয়নি। মদিনায় এসে যথারীতি জুমুআর জামায়াত পড়াও আরম্ভ হয়।

৩. জেহাদের নির্দেশ ঃ পূর্বে জিহাদের নির্দেশ ছিল না। প্রথম হিজরীর রমযান মাসে মুসলিমদের প্রতি জেহাদের নির্দেশ হয়।

৪. **আযান প্রবর্তন ঃ** মদিনায় মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হবার পর নির্ধারিত সময়ে প্রকাশ্যে সালাতের আহবানের জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। কেউ ঘণ্টাধনি, কেউ শিঙ্গা বাজানো আবার কেউ আগুন জ্বালাবার প্রস্তাব দিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এগুলো কোনোটিই পছন্দ করলেন না। তিনি হযরত বিলালকে নামাযের জন্য (বর্তমান প্রচলিত বাক্যগুলোর দ্বারা) উচ্চঃস্বরে আহবান করতে বলেন। সেই থেকে বর্তমান আযান পদ্ধতি চালু হয়।

৫. কিবলা পবির্তন ও জিহাদের নির্দেশ ঃ হিজরী দ্বিতীয় সালে ইসলামের ইতিহাসে দু'টি বিরাট ঘটনার সূত্রপাত হয়। তার একটি হচ্ছে মুসলিম জাহানের জন্য নিজস্ব কিবলা নির্ধারণ, যা আজও প্রায় দেড়শ কোটি মানুষের অন্তরের কেন্দ্রস্থল হিসেবে পরিগণিত। তখন থেকেই ইসলামের শত্রুরা তাঁর বিরোধিতার জন্য তরবারি ধারণ করে এবং মুসলিমগণ তা প্রতিহত করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। উবাই ইবনে কাব (রা) বলেন, "যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সহচরগণ মদিনায় আসেন এবং আনসারগণ তাঁদের আশ্রয় দেন তখন সমগ্র আরব একযোগে তাঁদের সাথে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়।" তখন জিহাদের নির্দেশ সংবলিত আয়াত অবতীর্ণ হয়- "যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসবে, আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর।" (সূরা বাকার-১৯০)

শিক্ষার্থীর কাজ	**মদীনা সনদের বিভিন্ন দিক নির্দেশ করুন।**

মদীনা সনদ কী ?	মদীনা সনদের ধারা কয়টি?	সনদে স্বাক্ষরকারী কয়েকটি সম্প্রদায়ের নাম লিখ।	মদীনা সনদে স্বক্ষরকারী কয়েকটি গোত্রের নাম উল্লেখ কর।

সারসংক্ষেপ :

মদীনার সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য, ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করে মদীনাতে একটি শান্তিপূর্ণ নগর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। সর্বোপরি আন্ত:ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রেখে মদীনা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য মহানবী (সা.) যে লিখিত সনদ প্রদান করেন তাই মদীনা সনদ। এটি পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ঐতিহাসিক মদিনা সনদে মোট কয়টি ধারা ছিল?
(ক) ৫৩টি (খ) ৫৪টি
(গ) ৪৭টি (ঘ) ৫৬টি

২। মদিনা সনদের ফলে সর্বতোভাবে স্বীকৃতি পেল-
i. নাগরিক অধিকার ii. সামাজিক মর্যাদা iii. ধর্মীয় স্বাধীনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। মদিনায় মহানবী (সা.)-এর আগমনের ফলে মদিনাবাসী-
i. সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয় ii. বিভিন্ন গোত্র পরস্পর কলহে লিপ্ত হয়
iii. ইহুদিদের সাথে সমঝোতার গড়ে ওঠে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১২১৫ সালে যুক্তরাজ্যের "সারির রাজিমিডে" ম্যাগনাকার্টা সনদ রচিত হয়। রাজাজনের আমলে তিনি যেসব রাজনৈতিক সংকটের সম্মূখীণ হয়েছিলেন তা সমাধান করতেই এ সনদ প্রনয়ণ করেন।এ সময় প্রভাবশালী ব্যরনার জনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং লণ্ডন দখল করে নেয়। তাই তাদের মাঝে সমঝোতা স্মারক হিসেবেই এ দলীল সম্পাদিত হয়। ইহা 'ম্যাগনাকার্টা' নামে পরিচিত।

(ক) মদীনা সনদে কতটি ধারা রয়েছে? ১
(খ) মসজিদে নববীর পরিচয় দাও। ২
(গ) উদ্দীপকের আলোকে তোমার পঠিত সনদটি তুলে ধর। ৩
(ঘ) মদীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় উক্ত সনদ ছিল মাইলফলক - উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

পাঠ-৪.৩ বদর যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গাযওয়া ও সারিয়ার পরিচয় জানতে পারবেন
- বদর যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।
- বদর যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**গাযওয়া, সারিয়ার, জিহাদ ও বদর যুদ্ধ**

গাযওয়া ও সারিয়ার পরিচয়

আল্লাহর পক্ষ থেকে কাফিরদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ নাযিল হওয়ার পর থেকে মুসলিমগণ কাফিরদের সাথে অনেকগুলো যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এগুলোর মধ্যে কতকগুলো যুদ্ধে মহানবী (সা.) নিজে অংশগ্রহণ করেছেন, আবার অনেক যুদ্ধে অভিজ্ঞ সাহাবীকে নিজের প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। যেসব যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বয়ং অংশ নিয়েছেন সেগুলো 'গাযওয়া' এবং যে সকল যুদ্ধে তিনি নিজে অংশ নেননি, সেগুলোকে 'সারিয়া' বলে। বেশির ভাগ গাযওয়া ছিল বড় আর সারিয়া ছিল ছোট। মহানবী (সা.)-এর জীবনে গাযওয়ার সংখ্যা ২৩টি আর সারিয়ার সংখ্যা ৪৩টি। এ সকল যুদ্ধে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওয়াদা মুতাবিক মুসলিমদের বিজয় দান করেন। তবে উহুদ এবং হুনায়নের যুদ্ধে মুসলিমদের অনেক ক্ষতি হয়েছিল। মুসলিমদের সমরনীতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য এ দুটি যুদ্ধে তাদের আল্লাহ তায়ালা সাময়িক পরীক্ষায় ফেলেন।

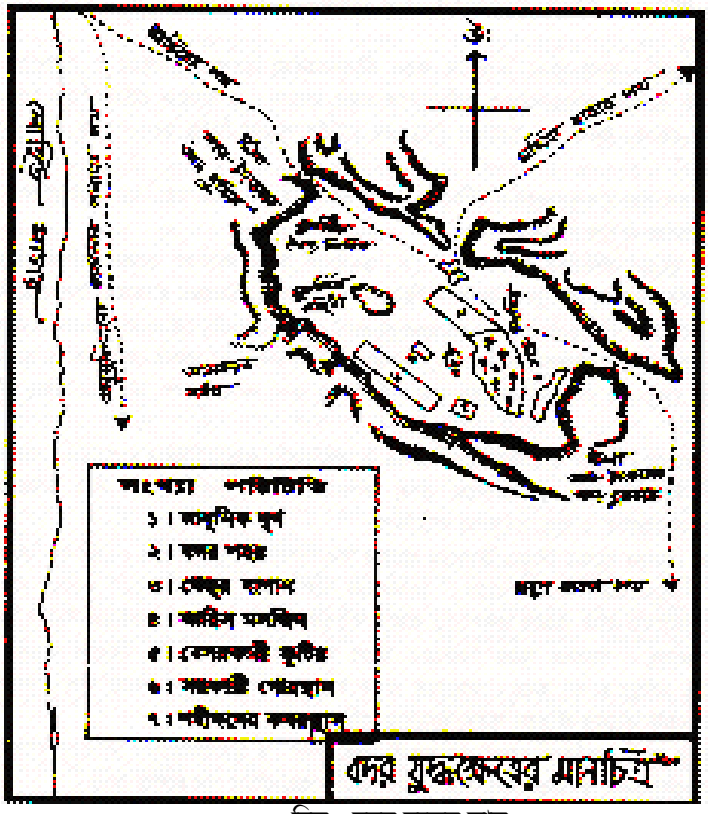

চিত্র : বদর যুদ্ধের স্থান

বদর যুদ্ধের কারণসমূহ

মদিনা থেকে প্রায় আশি মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি বাণিজ্যকেন্দ্রের নাম বদর। তখনকার দিনে এখানে পানির প্রাচুর্য থাকায় স্থানটির গুরুত্ব ছিল অত্যাধিক। এখানেই দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ রমযান মোতাবেক ৬২৪ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ শুক্রবার ইসলামের ইতিহাসের প্রথম সম্মুখযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটা বাহ্যত যুদ্ধ মনে হলেও বাস্তবে পৃথিবীর ইতিহাসে এর ফলে একটি সুমহান বিপ্লব সূচিত হয়েছিল। এ কারণেই কুরআনের ভাষায় একে 'ইয়াওমুল ফুরকান' বলা হয়েছে। পাশ্চাত্যে ইতিহাসবিদরাও এর গুরুত্ব স্বীকার করেন। ঐতিহাসিক পি কে হিট্টি তার '*History of the Arabs*' গ্রন্থে একে ইসলামের প্রকাশ্য বিজয় বলে অভিহিত করেছেন। নিম্নে এ যুদ্ধের কারণসমূহ আলোচনা করা হলো:

কুরাইশদের গাত্রদাহ ঃ মদিনায় মুহাম্মদ (সা.)-এর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর এ ক্রমবর্ধিষ্ণু ক্ষমতা ও ইসলামের দ্রুত প্রসার কুরাইশদের মনে ঈর্ষা ও শত্রুতার উদ্রেক করে। তাই তারা মুহাম্মদ (সা.)-কে মদিনা থেকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র আঁটে।

মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ঃ পাপিষ্ঠ মুনাফিক দলের সঙ্গে যোগসাজশ করে ইহুদিরা সংঘবদ্ধ হয় এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) তথা ইসলামের ধংস সাধনের জন্য গভীর ষড়যন্ত্র শুরু করে।

অর্থনৈতিক কারণ ঃ নির্বিঘ্নে ব্যবসায়-বাণিজ্য করার সুযোগ হারাতে হতে পারে, এ আশঙ্কায় কুরাইশরা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। ব্যবসায় ও মক্কার কাবা ঘরে গমনকারীদের চলাচল বন্ধ হলে সমূহ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে উপলব্ধি করে কুরাইশরা ইসলামের মূলোৎপাটনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, "মক্কার ব্যবসায়ীরা সিরিয়া, মিসর, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দেশের সাথে নিয়মিত ব্যবসায়-বাণিজ্য করতো, কিন্তু মদিনা মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ার ফলে মদিনার মধ্য দিয়ে কুরাইশদের একমাত্র বাণিজ্যপথ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।"

ইহুদিদে ষড়যন্ত্র ও শর্তভঙ্গ ঃ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি ইহুদিরা সহ্য করতে পারেনি। তাই সুবিধাভোগী কিছু ইহুদি নেতা মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুনাফিকদের সাথে মিশে নানাভাবে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। বিশ্বাসঘাতক ইহুদিরা মদিনা সনদের শর্ত ভঙ্গ করে কুরাইশদের মদিনা আক্রমণে প্ররোচিত করে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মহানুভবতা ও সহনশীলতার সুযোগে নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলে তৎপর হয়ে ওঠে। ফলে বদর যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়।

কুরাইশদের যুদ্ধের হুমকি ঃ মদিনাবাসীদের সঙ্গে মক্কার লোকদের বরাবরই ভালো সম্পর্ক ছিল, কিন্তু নবী করীম (সা.) ও তাঁর অনুসারীরা মদিনায় গেলে তাদের পূর্বের সে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। তাই কুরাইশরা মদিনাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দেয়।

আবু সুফিয়ানের অপপ্রচার ঃ মক্কার কুরাইশ কাফির নেতা আবু সুফিয়ান ব্যবসায় বাণিজ্যে আবরণে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য কাফেলা নিয়ে সিরিয়ায় গমণ করে। এ কাফিলায় প্রায় ৫০,০০০ দিনার মূল্যের ধন-রত্নাদি ছিল। নাখলার যুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়ে কুরাইশরা সিরিয়ায় গমনকারী কাফিলার মক্কায় নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের নিশ্চয়তা লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। মক্কায় জনরব ওঠে, আবু সুফিয়ানের কাফিলা মদিনার মুসলিমদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। গুজবের সত্যতা যাচাই না করেই আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করে আবু জাহল এক হাজার সৈন্য নিয়ে আবু সুফিয়ানের সাহায্যার্থে বদর অভিমুখে রওয়ানা হয়।

কুরাইশদের দস্যুবৃত্তি ঃ বদর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পেছনে কুরাইশদের দস্যুবৃত্তিকে একটা বড় কারণ বলে ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন। মদিনার সীমান্তবর্তী এলাকায় কুরাইশ এবং তাদের অনুগত সহযোগী আরব গোত্রগুলো মুসলিমদের শস্যক্ষেত্রে জ্বালিয়ে দিত, ফলবান বৃক্ষ ধ্বংশ করতে এবং উট, ছাগল ইত্যাদি অপহরণ করতো। সুতরাং এহেন কার্যকলাপের কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

নাখলা প্রান্তরে খণ্ডযুদ্ধ ঃ মদিনা সীমান্তে কুরাইশদের ক্রমবর্ধমান লুটতরাজ বন্ধ করার জন্য গোপন সংবাদ সংগ্রহে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহশের নেতৃত্বে একটি গোয়েন্দা দল দক্ষিণ আরবের নাখলায় প্রেরণ করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) কুরাইশ কাফিলাকে আক্রমণ করতে আদেশ না করা সত্ত্বেও আবদুল্লাহ (রা) ভুলবশত কাফেলার সঙ্গে সংঘর্ষে রত হলে নাখলায় এক খণ্ডযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়।

যুদ্ধের ঘটনা

মদিনা আক্রমণের জন্য মক্কার কাফিররা প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে আসছে- এ সংবাদে রাসূলুল্লাহ (সা.) খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় আল্লাহর এ নির্দেশ পেয়ে চিন্তামুক্ত হন। "আল্লাহর পথে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তবে সীমালঙ্ঘন করো না, কারণ আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।" ৬২৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ (১৭ রমযান দ্বিতীয় হিজরী) রাসূলুল্লাহ (সা.) ২৫৬ জন আনসার এবং ৬০ জন মুহাজির নিয়ে যুদ্ধ সংক্রান্ত মন্ত্রণাসভার পরামর্শক্রমে গঠিত একটি মুসলিম বাহিনীসহ কুরাইশ বাহিনীর মোকাবেলার জন্য বের হন। মদিনা থেকে ৮০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বদর উপত্যকায় মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে কুরাইশদের সংঘর্ষ হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

আল-আরিসা পাহাড়ের পাদদেশে মুসলিম বাহিনীর শিবির স্থাপিত হয়। ফলে পানির কূপগুলো তাদের আয়ত্তে ছিল। ঐতিহাসিক ওয়াকিদী বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা.) মুসলিম সৈন্য সমাবেশের জন্য এমন এক স্থান বেছে নেন যেখানে সূর্যোদয়ের পর যুদ্ধ শুরু হলে কোনো মুসলিম সৈন্যের চোখে সূর্য কিরণ না পড়ে।" প্রাচীন আরব-রেওয়াজ অনুযায়ী প্রথমে মল্লযুদ্ধ হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে হযরত আমীর হামযা, আলী ও আবু ওবায়দা কুরাইশ নেতা ওতবা, শায়বা এবং

ওয়ালিত ইবনে ওতবার সঙ্গে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এতে শত্রুপক্ষীয় নেতৃবৃন্দ শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও নিহত হয়। উপায়ন্তর না দেখে আবু জাহল নিজের বাহিনীসহ মুসলিম বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা মুসলিমদের ওপর প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করতে লাগল, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থা এবং সংঘবদ্ধ সুশৃঙ্খল মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা করা কুরাইশদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অসামান্য রণনৈপুণ্য, অপূর্ব বিক্রম ও অপরিসীম নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে যুদ্ধ করে মুসলিমগণ বদরের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে কুরাইশদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। অপরদিকে আবু জাহল ৭০ কুরাইশ সৈন্যসহ নিহত হয় এবং সমসংখ্যক কুরাইশ সৈন্য বন্দি হয়। এ যুদ্ধে মাত্র **১৪** জন মুসলিম সৈন্য শাহাদাত বরণ করেন।

বদর যুদ্ধের ফলাফল

বদর যুদ্ধ ইসলামের সর্বপ্রথম যুদ্ধ এবং অবিস্মরণীয় এক ঘটনা। মুসলিম শক্তি এ যুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্ব জয়ের সোপানে আরোহণ করে। এ যুদ্ধে কুরাইশ শক্তিকে পর্যুদস্ত করে মুসলিমরা প্রথম বারের মতো বিশ্বময় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। এ যুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার প্রসারের দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ঐতিহাসিক নিকলসন বলেন- The Battle of Badar is not only the most celebrated battle in the memory of Muslims, it was really also of a great historical importance. ইসলামের ইতিহাসে এ যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে ফলাফল আলোচনা করা হলো-
ঐতিহাসিক যোসেফ হেল বলেন, "বদরের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে প্রথম বড় ধরনের সামরিক বিজয়।" এ যুদ্ধে কাফিরদের ওপর মুসলিমদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। বিশাল কাফির বাহিনী অল্পসংখ্যক মুজাহিদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এ যুদ্ধ বিজয়ের মাধ্যমে ইসলাম বিজয়ের যুগে প্রবেশ করে। হিট্টি যথার্থই বলেছেন- Islam recovered and passed on gradually from the defensive to the offensive. হিট্টির মতে, "বদরের প্রান্তরে সম্মুখ যুদ্ধে মুসলিমগণ মৃত্যুকে উপেক্ষা করে নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তা তাদের পরবর্তী বিজয়ের পথকে সুগম করে। এ বিজয় দ্বীনের সূচনা করে এবং পরবর্তী একশ বছরের মধ্যে ইসলাম পশ্চিম আফ্রিকা থেকে পূর্বে ভারত উপমহাদেশ ও মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।"

বদরের যুদ্ধ মদিনা রাষ্ট্রকে সুসংবদ্ধ ইসলামী রাষ্ট্রে উন্নীত করে। বিজয়ীর বেশে মদিনায় ফিরে মহানবী (সা.) সুদক্ষ সমর নেতা, পরাক্রমশালী যোদ্ধা ও ন্যায়পরায়ণ শাসকে পরিণত হন। এমনকি বদর যুদ্ধে বিজয়ের ফলে মুসলিমদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হয়। মুসলিমগণ প্রচুর গনীমত লাভ করে। এতে ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত হয়। বদরের যুদ্ধের বন্দিদের সাথে রাসূল (সা.) মহত্ত্বপূর্ণ উদার আচরণ করেন। ফলে তাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে। এতে ইসলামের নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিজয় সাধিত হয়। এ যুদ্ধ বিজয়ের মাধ্যমে বিজয়ের যুগে প্রবেশ করে। সর্বোপরি বদর যুদ্ধে স্বল্পসংখ্যক মুসলিম সেনার জয়লাভ ছিল একটি চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারক ঘটনা।

শিক্ষার্থীর কাজ	**বদর যুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনাবলী চিহ্নিত করুন।**

বদর যুদ্ধের কুরাইশদের সৈন্য সংখ্যা কত ছিল?	মদীনা থেকে বদর প্রান্তরের অবস্থান কত মাইল দূরে?	বদর প্রান্তরের অবস্থান কত মাইল দূরে?	কুরাইশদের ব্যবহৃত অস্ত্রসমূহের নাম লিখ?

সারসংক্ষেপ :

মহানবী (সা.) তাঁর নবুয়াতী জীবনের **১৫**তম বছরে কুরাইশ কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রথম যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, তার নাম বদরের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে জয়ের মাধ্যমে দাম্ভিক কাফিরদের বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয় সূচিত হয়। তৎকালীন যুদ্ধনীতি অনুযায়ী পরাজিত বন্দীদের হত্যা না করে শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দিয়ে মহানবী (সা.) মানবতার ইতিহাসে যুদ্ধনীতিতে এক নব দিগন্তের সূচনা করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বদরের যুদ্ধ কত খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়?
   (ক) ৬২২ (খ) ৬২৪
   (গ) ৬২৫ (ঘ) ৬২৬

২. বদরের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা কত ছিল?
   (ক) ৩১০ (খ) ৩১৩
   (গ) ৩১৫ (ঘ) ৩২৫

৩. 'ইওয়ামুল কুরআন'- কোন ঘটনার সাথে সম্পর্কিত?
   (ক) হস্তির বছর (খ) মিরাজের বছর
   (গ) বদরের যুদ্ধের দিন (ঘ) হজ্জের দিন

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

জনাব আশরাফউদ্দিন ইসলামের ইতিহাসের ক্লাস নিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলামে কথায় কথায় যুদ্ধ বা লড়াই নিষিদ্ধ। তবে অন্যায় অবিচার ও দুর্নীতি প্রতিরোধ ইসলাম কর্বদাই সোচ্চার এবং এক্ষেত্রে উসলাম প্রয়োজনে যুদ্ধকে সমর্থন করে। মূলত মদীনায় ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একঠ নীতি নির্ধারণী যুদ্ধের মাধ্যমে। মুসলমানদের জন্য এটি ছিল একটি অগ্নি পরীক্ষা। সত্য মিথ্যার এ যুদ্ধে পরাজিত হলে মুসলমান রাষ্ট্র অংকুরেই ধ্বংশ হতো।

(ক) বদর যুদ্ধে কুরাইশদের নেতা কে ছিল? ১
(খ) গাফওয়া ও সারিয়ার পরিচয় দিন। ২
(গ) উদ্দীপকে ঈঙ্গিতকৃত যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করুন। ৩
(ঘ) মদীনায় ইসলামী প্রজাতন্ত্র সুদৃঢ় করনে এ যুদ্ধের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৪.৪ উহুদ যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উহুদ যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।
- উহুদ যুদ্ধের প্রকৃত বিজয়ী কারা তা অনুধাবন করতে পারবেন।
- মুনাফিকদের সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- উহুদ যুদ্ধের শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**উহুদ, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই, হিন্দা, আবু সুফিয়ান, আবু জাহিল, হামজা ও খালিদ বিন ওয়ালিদ**

উহুদ যুদ্ধ

মহানবী (সা.) এর জীবদ্দশায় কুরাইশ কাফিরদের সাথে মুসলিমদের সংগঠিত দ্বিতীয় যুদ্ধের নাম উহুদের যুদ্ধ। মদিনা থেকে তিন মাইল দূরে উহুদ পাহাড়। হিজরী তৃতীয় সালের শাওয়াল মাসে এ পাহাড়ের পাদদেশে উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের কারণসমূহ নিম্নরূপ:

উহুদ যুদ্ধের কারণসমূহ

বদর যুদ্ধে অধিকাংশ কুরাইশ নেতার মৃত্যু সংবাদে সারা আরব জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। ঘরে ঘরে কান্নার রোল পড়ে যায়। মক্কার অন্যতম নেতা আবু লাহাব এ দুঃসংবাদ শ্রবণে শয্যা গ্রহণ করে আর ওঠেনি। আবু সুফিয়ান প্রতিশোধের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে। সে বলতে লাগল, আমি যতদিন না এ পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পারি, ততদিন পর্যন্ত সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করব না, স্ত্রী স্পর্শ করব না। মোটকথা, কাফিররা স্ফুলিঙ্গের ন্যায় জ্বলে ওঠে। বদর যুদ্ধে বিজয়ের পর মুহাম্মদ (সা.)-এর নেতৃত্বে বনু হাশিম সম্প্রদায়ের ক্রমোন্নতি উমাইয়াদের অসহ্য হয়ে ওঠে। তাই কুরাইশদের দুটি শাখা হাশিমী ও উমাইয়ার মধ্যে শত্রুতা শুরু হয়, যা কম-বেশি উহুদ যুদ্ধে ইন্ধন যোগাতে সাহায্য করে।

ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন, বদরের বিপর্যয়ের পর ইহুদি কবি কাব বিন আশরাফ মক্কায় গমন করে কাব্য রচনা করে কুরাইশদের উত্তেজিত করতে থাকে। শুধু কুরাইশদেরই নয়, বেদুইনদেরও সে মুসলিমদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে তৎপর হয়। ফলে উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আর ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, "বদরে বিপর্যয়ের পর আবু সুফিয়ান ৪০০ সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে মদিনার সীমান্তে অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলায় মত্ত হলে মুসলিমরা তা প্রতিহত করতে অগ্রসর হয়, আর এতেই উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।"

উহুদ যুদ্ধের ঘটনাবলী

৩০০০ সৈন্য সমেত আবু সুফিয়ান মদিনা অভিমুখে অগ্রসর হয়। তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের ১৪ তারিখে মুহাম্মদ (সা.) জুমুআর সালাত আদায় করে সমবেত মুসলিমদের পরামর্শ সভায় বললেন, "এবার আমাদের নগর ছেড়ে দূরে গিয়ে যুদ্ধ করা সমীচীন হবে না। তাতে বিপদ ঘটতে পারে। তোমাদের মত কী?" বায়োজ্যেষ্ঠ মুহাজির ও আনসারগণ সকলে মহানবী (সা.)-এর মতে সাড়া দেন, কিন্তু এ প্রস্তাব তরুণ দলের মনঃপূত হয়নি। তারা এ ব্যবস্থাকে কাপুরুষতা মনে করে মদিনার বাইরে গিয়ে শত্রুর সম্মুখীন হওয়া সমীচীন ভাবে। শেষে অনেকেই তাদের মত সমর্থন করে।

হযরত মুহাম্মদ সকলকে রণসাজে সজ্জিত হতে নির্দেশ দেন। মোট এক হাজার সৈন্যের এ বাহিনীতে ২ জন মাত্র অশ্বারোহী, ৭০ জন বর্মধারী, ৪০ জন তীরন্দাজ, বাকি সকলেই বর্মহীন পদাতিক ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ৩০০ সৈন্য সমেত পথিমধ্য থেকে দলত্যাগ করে। উহুদ পাহাড়ের অপর পার্শ্বে গিয়ে রাসূল (সা.) একটি সুবিধাজনক স্থানে শিবির স্থাপন করেন- সম্মুখে যুদ্ধের ময়দান পেছনে পাহাড়। আবু সুফিয়ান তার বিরাট বাহিনী নিয়ে পূর্বেই উহুদ প্রান্তরে

অপেক্ষা করছিল। মুসলিম পক্ষের বামপার্শ্বে পর্বতগাত্রে একটি গিরিপথ ছিল। অনন্য সমরকুশলী মহানবী (সা.) এ গিরিপথের পশ্চাৎ দিক থেকে শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা)-এর নেতৃত্বে ৫০ জনের একটি তীরন্দাজ বাহিনী মোতায়ন করেন এবং পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁদের সেখানে অবস্থান করার হুকুম দেন।

উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। মুসলিমদের হাতে শত্রু পক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই ময়দানে টিকতে না পেরে কুরাইশরা পালাতে আরম্ভ করে। কুরাইশ সৈন্যদের পালাতে দেখে মুসলিমগণ পরিত্যক্ত সম্পদ মানে গনীমত সংগ্রহ করতে লেগে যায়। এ মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ ভুলে গিরিপথে নিয়োজিত তীরন্দাজ বাহিনীও গনীমত সংগ্রহে নেমে পড়ে। ৫০ জনের মধ্যে মাত্র দু'জন শেষ পর্যন্ত গিরিপথ পাহারায় নিযুক্ত থাকেন। দূর থেকে সুচতুর খালিদ এ দৃশ্য দেখে তার অশ্বারোহী সেনাদল নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে দু'জন তীরন্দাজকে অনায়াসে পরাজিত ও নিহত করে পশ্চাৎ দিক থেকে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করে। পলায়নপর কুরাইশ সৈন্যরাও ফিরে আসে। যুদ্ধ পুনরায় আরম্ভ হয়। বীরবর হামযা ও মুসয়াব শহীদ হন। মুসলিম সৈন্যগণ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন। বহু সাহাবা হতাহত হন। এবার কুরাইশরা মহানবী (সা.)-কে লক্ষ্য করে তীর ও অন্যান্য অস্ত্র প্রয়োগ করতে থাকে। উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সম্মুখের চারটি দাঁত মুবারক শহীদ হয় এবং ৭০ জন মুসলিম শাহাদাতবরণ করেন। কুরাইশদের পক্ষে ২৩ জন নিহত হয়। কয়েকজন সাহাবী নিজেদের জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করে মহানবী (সা.)-কে রক্ষা করার জন্য ব্যূহ রচনা করেন। বহু তীর তাঁদের শরীর বিদ্ধ করে। যুদ্ধের মাঠে এ খবর রটে গেল, মুহাম্মদ (সা.) নিহত হয়েছেন। এতে বহু মুসলিম হতোদ্যম হয়ে পড়েন। হযরত তালহা কাঁধে করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে তুলে নেন এবং তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এবার বিক্ষিপ্ত সাহাবাগণ আবার মহানবী (সা.)-এর চতুর্দিকে সমবেত হন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবাগণ যাঁরা মাঠে ছিলেন সকলে পর্বতে আরোহণ করেন। কাফিররা উঠতে চেয়ে ব্যর্থ হয়।

উহুদ যুদ্ধের ফলাফল

উহুদ যুদ্ধ মুসলিমদের জন্য ছিল ধৈর্যের অগ্নি পরীক্ষা। একথা সত্য, নিরবচ্ছিন্ন বিজয় কোনো জাতির ভাগ্যেই জুটে না। বিজয়ের আনন্দ ও পরাজয়ের গ্লানি সঙ্গী করেই বৃহত্তর সাফল্যের পথে এগিয়ে যেতে হয়। এজন্য প্রয়োজন ধৈর্যের। এ পরীক্ষায় মুসলিমগণ ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

ঈমানের দৃঢ়তা ঃ যুদ্ধোত্তরকালে আল্লাহ তায়ালা সূরা আলে ইমরানে মুসলিমদের খাঁটি মুমিন হতে এবং হকের ওপর দৃঢ়পদ থাকতে নির্দেশ প্রদান করেন। এ যুদ্ধের ফলে মুসলিমদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেদিন যুদ্ধের প্রথম দিক জয় লাভ করেও পরবর্তীতে তাদের পরাজয় মেনে নিতে হয়েছিল। তাই পরবর্তী যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল সেগুলোতে তারা মহানবী (সা.)-এর আদেশ নির্দেশ পুরোপুরি মেনেই যুদ্ধ করেছিলেন। ফলে বলা যেতে পারে, উহুদ যুদ্ধ মুসলিমদের জন্য ঈমানী পরীক্ষা হিসেবে কাজ করেছিল।

ইহুদিদের মদিনা সনদের শর্ত ভঙ্গের শাস্তি ঃ ঐতিহাসিক পি.কে.হিট্টি বলেন, ইহুদি বনু নযির ও বনু কায়নুকা গোত্র মদিনা সনদের শর্ত ভঙ্গ করে কুরাইশদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে মদিনা থেকে বহিষ্কৃত হয়।

জয় পরাজয়ের অভিজ্ঞতা ঃ উহুদ রাণাঙ্গনে প্রাথমিকভাবে মুসলিমদের বিজয় এবং সে কারণে উল্লাস ও বিশৃঙ্খলাই পরবর্তীতে পরাজয়ে পর্যবসিত হয়। অপরদিকে কুরাইশরা আপাত জয়লাভ করলেও এর কোনো সুফল ভোগ করতে পারেনি; বরং নৈতিক দুর্বলতাহেতু মনোবল হারিয়ে ময়দান ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়।

মুসলিমদের বীরত্ব বৃদ্ধি ঃ উহুদের পরাজয় মুসলিমদের বীরত্ব অধিকতর বৃদ্ধি করেছিল। মদিনায় প্রত্যাগমনের পর মহানবী (সা.) একদল সাহাবীকে মক্কাবাসী কুরাইশদের পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দেন। এতে তারা অতুলনীয় সাহস, মনোবল ও বীর্যবত্তার প্রমাণ দিয়েছিলেন।

পরবর্তী বিজয়ের পথ উন্মোচন ঃ উহুদ যুদ্ধ মুসলিমদের জন্য ছিল এক বিরাট শিক্ষা। উহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী নেতার আদেশ মানা এবং শৃঙ্খলা রক্ষার শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, তাই পরবর্তীতে কোনো যুদ্ধেই তারা আর এ ভুল করেননি। অতএব উহুদের পরাজয় মুসলিমদের ভবিষ্যৎ সাফল্যের পথ উন্মুক্ত করেছিল।

কাফিরদেই পরাজয় ঘটে ঃ মুসলিমগণ যদি উহুদে পরাজিতই হতো, তাহলে কুরাইশরা মদিনা আক্রমণ করতো। কেননা মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যেই তারা এসেছিল। সুতরাং উহুদে তাদের পরাজয়ই হয়েছিল। কাফিররা সত্যিই যে মুসলিমদের

ওপর জয়ী হতে পারেনি, আবু সুফিয়ান তা ভালোভাবে বুঝেছিল। নতুবা যুদ্ধশেষে সে "আগামী বছর তোমাদের সাথে বুঝাপড়া হবে" কেন বলল?

উহুদ যুদ্ধের শিক্ষা

প্রথমত, মুসলিম তরুণরা রাসূল (সা.) ও অন্যান্য সাহাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে না পেরে মদিনা শহরের বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। যুদ্ধ জয় অপেক্ষা গনীমত সংগ্রহ প্রবণতাই অনেকের মধ্যে ছিল প্রবল। মহানবী (সা.)-এর কড়া হুকুম সত্ত্বেও তীরন্দাজদের স্থান ত্যাগই এর প্রমাণ। নেতার আদেশ ও অভিমতের প্রতি এহেন অশ্রদ্ধা যে ভয়ঙ্কর দোষের, উহুদ যুদ্ধে মুসলিমগণ তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিল। এ যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার ফলে পরবর্তীকালে কখনো এ ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। কাজেই বলতে হবে, অমঙ্গলের মধ্য দিয়ে মুসলিমদের মঙ্গল সাধিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, শত্রুর শাণিত তরবারি মহানবী (সা.)-এর মস্তকে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল; এমন দুর্যোগের মধ্যেও তিনি নেতার আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, সংকট মুহূর্তেও তিনি বিচলিত হননি, কর্তব্য পালনে ভুল করেননি। বিক্ষিপ্ত মুসলিম সৈন্যদের তিনি একত্র করেছিলেন এবং তাঁর নৈতিক মনোবল রক্ষা করতে পেরেছিলেন। এরূপ অবস্থায় পড়লে কিরূপ ধৈর্য ও ত্যাগ তিতিক্ষার প্রয়োজন, উহুদ যুদ্ধ বিপর্যয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর অনুসারীদের তা দেখিয়ে দিয়েছেন।

তৃতীয়ত, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যদি মৃত্যু ঘটে তবে মুসলিমগণ কোন আলোকে এটা গ্রহণ করবে- নির্দেশিত পথে চলবে নাকি উদভ্রান্তের নতো পথ চলবে, মুসলিমদের এ পরীক্ষাও এখানে দিতে হয়েছিল।

সর্বোপরি, ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হলে দোয়াকালাম, ঝাড়ফুঁক, তাবিজ কবজ আর ওয়ায নসিহতই যথেষ্ট নয়। এ কাজে সমরনীতি, সমর কৌশল ও বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। সে ক্ষেত্রে সমরবিশেষে জীবনের বাজিও রাখতে হয়।

উহুদের যুদ্ধে কে চূড়ান্ত বিজয় কার?

বাহ্য দৃষ্টিতে যদিও পরাজয় মনে হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুসলিমগণ এ যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন। ইসলাম অগ্রগতি, আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে চলেছে বদর যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে। আত্মপ্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতির এ পথে ভাগ্য বিপর্যয় ঘটতে পারে; কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। রাসূল (সা.)-এর জীবনকে খণ্ডিত দৃষ্টিতে না দেখে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। এ দৃষ্টিকোণে দেখলে প্রকৃতপক্ষে উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় হয়েছিল; পরাজয় নয়। শত্রুজয় অপেক্ষা আত্মজয় করতে পারে কিনা, বিপদের দিনে ধৈর্যধারণ করতে পারে কিনা, জয়ের সঙ্গে পরাজয়কে তারা সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারে কিনা, সত্যের জন্য মরণ বরণ করতে প্রস্তুত আছে কিনা, এটার ছিল এ যুদ্ধের অন্তর্নিহিত পরীক্ষা। তাঁরা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এ কারণেই তাঁরা বিজয়ী।

যদি মুসলামানগণ উহুদের যুদ্ধে পরাজিতই হতো; তাহলে কাফিররা মদিনা আক্রমণ করতো। কেননা তারা মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যেই এসেছিল। সুতরাং উহুদে কুরাইশদের পরাজয় হয়েছিল। মুসলিমদের ওপর কাফিররা যে জয়ী হতে পারেনি ভালোভাবে তা আবু সুফিয়ান বুঝেছিল। নতুবা যুদ্ধশেষে "আগামী বছর তোমাদের সাথে বুঝাপড়া হবে" বলল কেন? মহানবী (সা.)-কে হত্যা করার জন্য যে সকল কুরাইশ নেতা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল, উহুদ ও বদরে তাদের বেশিরভাগ নিহত হয়েছিল। পরবর্তীকালে বাদবাকি সকলে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। মুসলিমদের এতেও বিজয় হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	উহুদ যুদ্ধের বিভিন্ন দিক চিত্রিত করুন।

উহুদের পরিচয় কী ?	উহুদ যুদ্ধের দুই দলের সৈন্য সংখ্যা কত ছিল?	উহুদ প্রান্তর মদীনার কত মাইল দূরে?	পাহাড়ের পেছন থেকে আক্রমন করে মুসলিমদের পর্যূদস্থ করেছিল কে?

সারসংক্ষেপ :

মক্কার কাফিররা বদর যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে মুসলিমদের উপর যে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়, তার নাম উহুদের যুদ্ধ। বাহ্যিকভাবে এ যুদ্ধে মুসলিমদের বেশী ক্ষতিসাধন হলেও সার্বিক বিচারে কাফিররাই পরাজিত হয়। এ যুদ্ধের শিক্ষা পরবর্তীকালে মুসলিমদের যুদ্ধনীতি প্রণয়নে অনেক সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. উহুদ যুদ্ধে মুসলিম ও কাফির সৈন্যসংখ্যার অনুপাত কত ছিল?
(ক) ৭০০:৩০০০ (খ) ১০০০:৩০০০
(গ) ৩১৩: ১০০০ (ঘ) কোনটাই নয়

২. উহুদ যুদ্ধের সময় কার নেতৃত্বে ৩০০ মুসলিম সৈন্য ফিরে গিয়েছিল?
(ক) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (খ) আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস
(গ) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (ঘ) আবদুল্লাহ ইবনে জাহাস

৩. উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ কোনটি?
(ক) যুদ্ধোপকরণের অভাব (খ) গনীমতের মাল সংগ্রহ
(গ) সিপাহ্সালারের নির্দেশ অমান্য (ঘ) কাফিরদের সৈন্যসংখ্যাধিক্য

৪. উহুদের যুদ্ধে নিম্নের কোন চরিত্র চিহ্নিত হয়?
(ক) মুনাফিক (খ) মুশরিক
(গ) কাফির (ঘ) অমুসলিম

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

হেদায়েতুল্লাহ একজন মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধের পর বাড়ীতে ফিরে তিনি প্রতিবেশীদের বিভিন্ন বর্ণনা দিচ্ছিলেন। একটি যুদ্ধে তাদের দলের অনেক ক্ষতি হয়। বেশ কয়েকজন সহযোদ্ধাও নিহত হয়। হেদায়েত সাহেবের কাধেঁও একটি বুলেট লেগেছিল। আলী হোসেন এর কারণ জানতে চাইল। হেদায়েতুল্লাহ বললেন, আসলে তাদের রণকৌশল ঠিকই ছিল। কিন্তু প্রথমদিকে তাদের আক্রমণে বেশ কিছু পাকিস্তানী হানাদার সৈন্য মারা যায়। এতে উল্লাসিত হয়ে সেক্টর কমাণ্ডারের নির্দেশ অমান্য করে বেশ কিছু মুক্তিযোদ্ধা প্রকাশ্যে এসে যুদ্ধ শুরু করে। ফলে সমগ্র টীমে বিশৃংঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্থানীরা অতর্কিত আক্রমণ করে। পরে অবশ্য এ ভূল থেকে তারা বিরাট শিক্ষা লাভ করে।

(ক) গানিমাহ কী? ১
(খ) আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই-এর পরিচয় দাও। ২
(গ) উদ্দীপকের ঘটনার সাথে মোহাম্মদ (সা.) কোন যুদ্ধ সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা দিন। ৩
(ঘ) উক্ত যুদ্ধের পরাজয়ই পরবর্তী যুদ্ধসমূহের সফলতা- উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৪.৫ খন্দক বা আহযাবের যুদ্ধ (৬২৭ সাল)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরিখা খননের মাধ্যমে শত্রুকে রক্তপাতের পরিবর্তে কৌশলে পরাজিত করার বিষয়ে জানতে পারবেন।
- খন্দক যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল জানতে পারবেন এবং
- ইহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**খন্দক বা পরিখা, সালমান ফারসী ও আহযাব**

আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধ

বনু নযির গোত্র মদিনা থেকে নির্বাসিত হলে তাদের একাংশ হুয়াই বিন আখতাবের নেতৃত্বে খায়বারে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। তারা আশেপাশের আরব গোত্রগুলোকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে। হুয়াই মক্কায় গিয়ে কুরাইশদের সঙ্গে ষড়যন্তে লিপ্ত হয়। তারা সিদ্ধান্ত নেয়, একযোগে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করা হবে, যাতে তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সর্বত্র যুদ্ধের একটা সাজ সাজ রব পড়ে যায়। আরবের বিভিন্ন গোত্রের প্রায় ১০,০০০ সৈন্য মদিনা আক্রমণের জন্য একত্র হয়। কুরাইশ ব্যতীত তাদের মধ্যে বনু নযির, বনু ওয়ায়ল অন্তর্ভূক্ত ছিল। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে দশ হাযার সৈন্যের সম্মিলিত বাহিনী মদিনা অভিমুখে রওয়ানা হয়। পঞ্চম হিজরীতে আরবের বিভিন্ন গোত্রের গঠিত এ বাহিনী একযোগে মদিনা আক্রমণ করার কারণে এ যুদ্ধকে আহযাব বা দলসমূহের যুদ্ধ বলা হয়।

খন্দক যুদ্ধের নামকরণ

খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ ঃ ফার্সি 'খান' থেকে খন্দক শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ পরিখা। মদিনার তিন দিকে ঘরবাড়ি ও খেজুর বাগান থাকায় তা প্রাচীর বেষ্টনীর ন্যায় নিরাপদ ছিল, কিন্তু উত্তর ও উত্তর পশ্চিম দিক ছিল উন্মুক্ত। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সালমান ফারসি (রা)-এর পরামর্শ ও মজলিসে শূরার সিদ্ধান্তে মহানবী (সা.) মদিনার উন্মুক্ত দিকে পাঁচ হাত গভীর এক পরিখা খনন করেন বিধায় একে পরিখা বা খন্দকের যুদ্ধ বলা হয়। ঐতিহাসিক আমীর আলী এ যুদ্ধকে Battle of Confederates (সম্মিলিত শক্তিসমূহের যুদ্ধ) বলে অভিহিত করেছেন। আল কুরআনের সূরা আহযাবের ২০ নং আয়াতে 'আহযাব' নামকরণ স্বীকৃত হয়েছে।

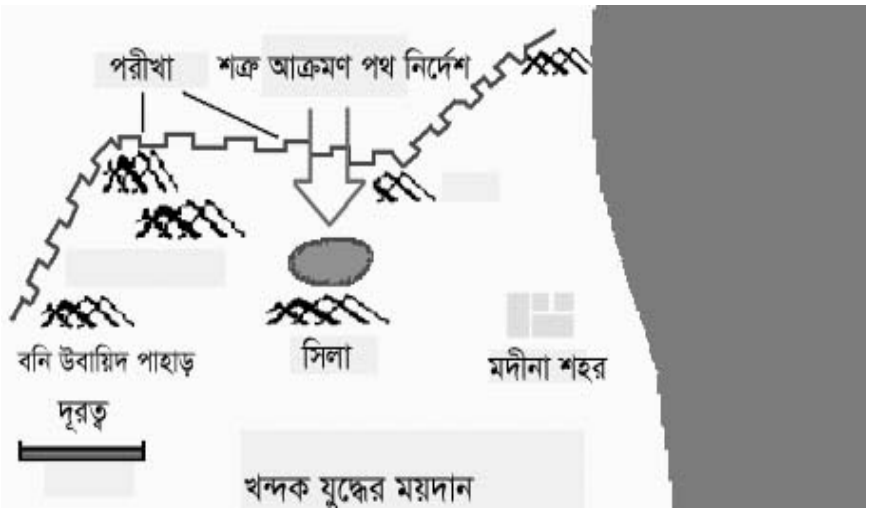

খন্দক যুদ্ধের কারণসমূহ

ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা ঃ বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ইহুদি বনু কায়নুকা ও বনু নযির গোত্রদ্বয়কে মদিনা থেকে নির্বাসিত করা হয়। তারা স্বভাবত কুরাইশদের সাথে হাত মিলায়। ইহুদি নেতা হুয়াই ইবনে আখতাব মক্কায় গিয়ে কুরাইশদের সাথে পরামর্শ করতে থাকে। কেনানা ইবনে রবী গাতফান গোত্র গমণ করে তাদের মুসলিমদের বিরুদ্ধে

উত্তেজিত করে তোলে। খায়বারে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তাদের দেয়া হবে- এটাও স্থিরীকৃত হয়। গাতফান গোত্রের সাথে বনী আসাদ বংশের সন্ধি ও মিত্রতা ছিল, তারাও প্রস্তুত হয়। বনী সলিম এবং নবী আসাদ গোত্রও সম্মিলিত কাফির বাহিনীর সঙ্গে যোগদান করে। কাব বনু কোরায়যার সকলকে একত্র করে তাদের সম্মুখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সম্পর্কিত সন্ধিপত্রখানা টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলে।

কুরাইশদের আশাভঙ্গ ঃ উহুদ যুদ্ধে কুরাইশরা আপাত জয়ী হলেও মদিনা দখলসহ পূর্ণাঙ্গ বিজয়লাভে ব্যর্থ হয়। তাছাড়াও তাদের সিরিয়ার বাণিজ্যপথ হুমকিপূর্ণ থেকেই যায়। এসব কারণে আশাহত কুরাইশরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে আরেকটি চূড়ান্ত আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

মদিনা রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধি ঃ ঐতিহাসিক মাসুদী বলেন, উহুদের বিপর্যয় পরবর্তীকালে মুসলিমদের নতুনভাবে ঐক্য সংহতির মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে। মদিনা রাষ্ট্রের জাতি গঠন বা Nation building এবং State building প্রক্রিয়া মুসলিমদের শক্তিশালী করে তোলে। কাফির, মুশরিক ও ইহুদি ষড়যন্ত্রকারীদের তা সহ্য হয়নি, তাই তারা আরেকটি যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি ঃ ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, বদর এবং উহুদে যুদ্ধ করেও মুসলিমগণ ক্লান্ত হয়ে পড়েনি; বরং ইসলাম প্রচারে তাদের প্রেরণা ছিল প্রত্যয়দৃপ্ত। কাফিররা তা মোটেই সহ্য করতে পারছিল না। তাই তারা সম্মিলিতভাবে মুসলিম উম্মাহকে সমূলে ধংস করতে সংকল্পবদ্ধ হয়।

কুরাইশদের যুদ্ধ প্রস্তুতি ঃ উহুদ যুদ্ধ শেষে আবু সুফিয়ান প্রতিজ্ঞা করেছিল, পরের বছর তারা আবার মুসলিমদের সাথে শক্তি পরীক্ষা করবে, কিন্তু আবু সুয়িান ও তার অনুসারীদের এ আস্ফালন সত্যে পরিণত হয়নি। কাজেই এখন যুদ্ধ করতে অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ও শক্তিশালী আয়োজন দরকার। এ কথা ভেবে আবু সুফিয়ান সারা আরবময় ইসলাম, মুসলিম, ইসলামের নবী এবং মদিনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহ সৃষ্টির প্রয়াস চালায়।

খন্দক যুদ্ধের ঐতিহাসিক ঘটনা

রাসূলের পরামর্শ সভা ও যুদ্ধকৌশল নির্ধারণ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) কুরাইশদের নেতৃত্বে সম্মিলিত আরব বাহিনীর অভিযানের সংবাদ পেয়ে সাহাবীদের ডেকে পরামর্শ করলেন। সালমান ফারসি (রা) ইরানি হওয়ার কারণে যুদ্ধে খন্দক বা পরিখা সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি মত প্রকাশ করলেন, খোলা ময়দানে নেমে যুদ্ধ করা সমীচীন হবে না; বরং একটি নিরাপদ স্থানে সৈন্য মোতায়েন করে চতুষ্পার্শে পরিখা খনন করতঃ আগে থেকেই সে জায়গাটা সুরক্ষিত করে রাখাই হবে বিচক্ষণতার কাজ। সকলেই তাঁর এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। কাফির বাহিনী পরিখা দেখে বিস্মিত হয়। কারণ আরবরা এটা কখনো দেখেনি। বিশ দিন পর্যন্ত কোনো পক্ষই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়নি।

যুদ্ধের ঘটনাবলী ঃ শেষ পর্যন্ত কাফির বাহিনী ব্যাপক আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ঘটনাক্রমে খন্দকের এক স্থানে প্রস্থ একটু কম ছিল। এ স্থান দিয়েই আরবের বিখ্যাত বীররা ঘোড়া হাঁকিয়ে অপর পারে গিয়ে ওঠে। আমর ইবনে আবদুদ ছিল তাদের মধ্যে শক্তিশালী। সে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী যুদ্ধের আহবান জানায়। এ আহবানে মুসলিমদের পক্ষ থেকে এগিয়ে যান শেরে খোদা হযরত আলী (রা)। প্রথমে ইবনে আবদুদ আক্রমণ করলে আলী (রা) ঢাল দ্বারা এ আক্রমণ প্রতিহত করেন। যদিও তাঁর মাথায় আঘাত লেগেছিল। আলীর অপর এক আঘাতে আবদুদের বাজু কেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আলী (রা) 'আল্লাহু আকবার' ধনি দিয়ে বিজয় ঘোষণা করেন। এরপর যেরার ও যোবায়র ময়দানে আসে। যুলফিকারের অজেয় বাহু উঠাতেই তারা পেছনে হটতে আরম্ভ করে। হযরত উমর (রা)-সহ অন্যান্য সাহাবীগণ সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করেন। অনেক কুখ্যাত কাফির নিহত হলো। এ সময় কাফিররা সব দিক থেকে তীর নিক্ষেপ করছিল। দিন যতই বাড়তে লাগল অবরোধকারীদের মনোবল ততই হ্রাস পেতে লাগল। দশ হাযার সৈন্যের খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করা সহজ ব্যাপার ছিল না। আবার তখন ছিল শীতকাল। তার মধ্যে এক সময় এমন প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল, যাতে তাদের তাঁবুর রশিগুলো ছিঁড়ে গেল, খুঁটিগুলো উপড়ে পড়ল, অশ্বগুলো সৈন্যদের মাঝে ছুটাছুটি করতে লাগল, ডেগ-ডেগচি উল্টে গেল। মুসলিমদের জন্য এ ঝঞ্ঝা-প্রবাহ সৈন্য অপেক্ষা অধিক সমর শক্তির কাজ করে। প্রচণ্ড বায়ুর চাপে কুরাইশরা ভীত হয়ে প্রত্যাবর্তন করতে মনস্থ করল। আবু সুফিয়ান সৈন্যদের বলল, এ মাঠে পড়ে সংকীর্ণতার সম্মুখীন হতে চলেছি, এখানে থাকা উচিত নয়- এ বলে সে সৈন্যদের প্রত্যাবর্তনের আদেশ করে। এভাবে পরাজয় মেনে নিয়ে সবাই পালিয়ে যায়।

মুসলিমদের নিষ্কণ্টক বিজয় ঃ একটি মাত্র রাতের ব্যবধানে আল্লাহ কত পরিবর্তন এনে দিলেন। গতকাল যেখানে জাহান্নামের আগুন জ্বলছিল, আজ সেখানে জান্নাতের স্নিগ্ধ বারিধারা প্রবাহিত হচ্ছে। গতকাল যেখানে মিথ্যার ভয়ঙ্কর অভিনয় চলছিল, আজ সেখানে সত্য ও সুন্দরের মাহফিল বসেছে। কৃতজ্ঞতায় তখন মুসলিমদের অন্তর ভরে যায়। আল্লাহকে ধন্যবাদ জানায় তারা সদলবলে।

যুদ্ধের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ঃ

এ যুদ্ধে কুরাইশগণ প্রমাণ পেল, ইসলাম দুর্নিবার। তিন তিনবার তারা শক্তি পরীক্ষা করে দেখেছে, তিন তিনবারই তারা বিফল হয়েছে। এ যুদ্ধকে ইসলামের চূড়ান্ত যুদ্ধ বলা যেতে পারে। তারা বদরে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে, উহুদেও মুসলিমদের পরাজিত করতে পারেনি, খন্দকে তারা আরবের সমস্ত শক্তি নিয়েও পরাজিত হয়েছে। তাই খন্দক যুদ্ধের পর তাদের নৈতিক বল শক্তি ভেঙে পড়ে। একটা হীনতা ও পরাজয়ের মনোভাব তাদের সকলকে পেয়ে বসে। পক্ষান্তরে মুসলিমদের বুকে প্রবল নবপ্রেরণা সঞ্চারিত হয়। নির্ভীক উন্নতশিরে বিশ্বের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তারা প্রস্তুত হয়। কোনো বাধাই তাদের আটকে রাখতে পারবে না, সকল শত্রুই যে তাদের পদানত হবে, ইসলাম যে সর্বত্র জয়যুক্ত হবে- এ কথা এ যুদ্ধের পর থেকে তারা সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করেন। এ যুদ্ধে জয় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মহিমাও মর্যাদা শতগুণে বর্ধিত হয়।

আল্লাহ তায়ালার সাহায্য লাভ ঃ খন্দকের যুদ্ধে মুসলিমগণ মহান আল্লাহ তায়ালার সাহায্য সহযোগিতা লাভ করেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, "আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল। অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম যাদের তোমরা দেখতে না, তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।"

ইসলামের অগ্রাভিযানে নতুন দিগন্ত উন্মোচন ঃ খন্দক যুদ্ধ সম্মিলিত বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ও মুসলিমদের জয়লাভের ফলে ইসলামের অগ্রাভিযানে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। খন্দক যুদ্ধের পরের বছর হুদায়বিয়ার সন্ধি, পরবর্তী বছর উমরা, তার পরের বছর মক্কা বিজয় সাধিত হয়।

সম্মিলিত বাহিনীর পরাজয় ঃ খন্দক যুদ্ধে কুরাইশ, ইহুদি, বেদুইন, মদিনার মুনাফেক ও পৌত্তলিকরা সম্মিলিতভাবে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, কিন্তু সর্বশেষ এ বাহিনীর শক্তি ধ্বংস হয়ে যায়। মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। ঐতিহাসিক ইমামুদ্দিন বলেন, সম্মিলিত বাহিনীতে ভাঙনের ফলে মক্কাবাসীদের পরাজয় প্রতিভাত হয়ে ওঠে এবং মদিনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় হয়।

মহানবীর মর্যাদা বৃদ্ধি ঃ পরিখার যুদ্ধে জয়লাভের ফলে মদিনাসহ সমগ্র আরব বিশ্বে মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। পাশবর্তী বহু জাতি গোষ্ঠি স্বেচ্ছায় মহানবী (সা.)-এর আধিপত্য ও নেতৃত্ব মেনে নেয় এবং তাদের অনেকেই ইসলাম কবুল করে।

ইহুদিদের বহিষ্কার ঃ খন্দক যুদ্ধের পর বিশ্বাসঘাতক ইহুদি গোত্র বনু কুরায়যার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ গোত্রের অপরাধী যোদ্ধাদের হত্যা করা হয় এবং বাকি লোকদের বন্দি ও নির্বাসিত করা হয়।

ইসলামের প্রসার ঃ আহযাব বা খন্দক যুদ্ধের পর আরব উপদ্বীপ ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং আরবের অনেক গোত্র মদিনা রাষ্ট্রের সাথে স্বেচ্ছায় মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হয়। এ প্রসঙ্গে ড. ইমামুদ্দিন বলেন, "এ যুদ্ধের পর অল্প সময়ে মধ্যে ইসলাম সমগ্র আরব এবং নিকর্টবর্তী দেশগুলোতে পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।"

শিক্ষার্থীর কাজ	খন্দকের যুদ্ধের পরিচয় দিন।

পরীখা কী?	কার পরামর্শে খন্দক খনন করা হয়?	খন্দকের যুদ্ধের মুসলিম-বিরোধী দলের নাম লিখুন?	খন্দকের যুদ্ধ প্রান্তরের চিত্র অংকন করুন।

সারসংক্ষেপ ঃ

এ যুদ্ধে কুরাইশদের সামরিক শক্তির দুর্বলতা প্রকাশ পায়। পরিখার যুদ্ধ ইতিহাসের মোড় ঘুড়িয়ে দেয়। তাদের খাদ্যসামগ্রী নিঃশেষ হয়, সম্মান বিনষ্ট হয় এবং মিত্রশক্তি ঘৃণায় তাদের দল ত্যাগ করে চলে যায়। পরিখার যুদ্ধ হযরত মুহাম্মদ (সা.) তথা মুসলিমদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দেয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) শত্রুদের হাত থেকে মদিনাকে রক্ষা করায় মদিনাবাসী তাঁকে একচ্ছত্র অধিপতি বলে সম্মান করতে লাগল। প্রতিপক্ষের বিরাট সেনাবাহিনীর ওপর মুসলিমদের এ বিজয় ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তারা স্বেচ্ছায় মুসলিমদের মিত্র হয়। এরই মধ্যে ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করতে লাগল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. খন্দক যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয়ের অন্যতম কারণ কোনটি?
   (ক) পরীখা খনন (খ) প্রাকৃতিক দূর্যোগ (গ) মুসলিম সামরিক কৌশল (ঘ) সব কয়টি

২. খন্দকের যুদ্ধের আরেক নাম কী?
   (ক) আহযাব (খ) আহগায (গ) আবরার (ঘ) আহযার

৩. উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ কোনটি?
   (ক) যুদ্ধোপকরণের অভাব (খ) গনীমতের মাল সংগ্রহ
   (গ) সিপাহসালারের নির্দেশ অমান্য (ঘ) কাফিরদের সৈন্যসংখ্যাধিক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে মোকাবিলা করার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করেন। শত্রপক্ষ যেন এলাকায় প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য প্রধান প্রধান ব্রীজ ভেঙ্গে দেয়া হয়। শত্রুর বোমা থেকে মানুষকে রক্ষার লক্ষে মাটি কেটে বাঙ্কার তৈরি করা হয়। ফলে শত্রুবাহিনী ভারী অস্ত্র ও ট্যাংক নিয়ে বিভিন্ন স্থানে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়। এসব যুদ্ধ কৌশল মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় অর্জনে সহায়তা করে।

(ক) আহযাব অর্থ কী? ১
(খ) সালমান ফারসির পরিচয় দিন। ২
(গ) বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের এ যুদ্ধকৌশল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কোন যুদ্ধকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করুন। ৩
(ঘ) "উক্ত যুদ্ধকৌশল মুসলিম রাষ্ট্রকে সুদৃঢ় করেছে।" উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৪.৬ হুদাইবিয়ার সন্ধি (৬২৮ সাল, ৬ষ্ঠ হিজরী)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তাবলী সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- হুদাইবিয়ার ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	হুদাইবিয়ার, উমরাহ, সন্ধি, বাইয়াতুর রিদওয়ান, বুদায়েল ও ফাতহুম মুবিন

হুদাইবিয়ার সন্ধি

মুসলিমগণ নির্যাতিত হয়ে স্বদেশ ছেড়ে মদিনায় আশ্রয় গ্রহণ করার ছয় বছর অতিক্রান্ত হয়। এ ছয় বছরে তাঁর একটিবারের জন্যও তারা মক্কায় আসতে পারেননি। কাবা শরীফের যিয়ারতের ভাগ্যও তাদের হয়নি। হজ্জ আদায় করতে না পারায়ও তারা কম মানসিক অশান্তিতে ছিলেন না। একদিন তাঁরা হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে বললেন, আমরা কি আর কখনো মক্কায় যেতে পারব না? এরমধ্যে একদা মহানবী (সা.) স্বপ্নে দেখেন, মক্কা শরীফে গিয়ে উমরা পালন করছেন। তিনি সাহাবাদের নিকট এ স্বপ্ন প্রকাশ করলে তারা মক্কায় গমন এবং খানায়ে কাবা যিয়ারত করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বপ্নের কথা শুনে সকলে মক্কা শরীফে গমনের জন্য প্রস্তুত হন।

সন্ধি প্রস্তাবঃ উসমান (রা)-কে আটক করে রাখলে জনরব ওঠে, কুরাইশরা তাকে হত্যা করেছে। জীবন উৎসর্গ করে মুসলিম যোদ্ধাগণ উসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য রাসূলুল্লাহর হাতে হাত রেখে শেষ বাইয়াত নিলেন। এমনকি রক্তবিন্দু অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত সকলেই লড়াই অব্যাহত রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে মহানবীর হাতে শপথ গ্রহন করে, একে '*বাইয়াতুর রিদওয়ান*' বলা হয়। এতে কুরাইশরা ভয়ে পেয়ে যায় এবং উসমান (রা.)-কে মুক্তি ও সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে সোহায়লকে পাঠায়। মুসলিমদের পক্ষে হযরত আলী (রা:) সন্ধির কার্যাবলী সম্পাদন করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) সানন্দে তাদের এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

সন্ধির শর্তাবলী

হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রধান প্রধান শর্তাবলী নিম্নরূপ

১. এ বছর মুসলিমগণ উমরা না করেই মদিনায় প্রত্যাবর্তন করবেন। যদি মুসলিমগণ ইচ্ছা করে তাহলে পরের বছর তিন দিনের জন্য উমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করতে পারবে। মুসলিমদের অবস্থানকালে কুরাইশগণ মক্কা নগর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেবে।
২. কুরাইশ ও মুসলিমদের মধ্যে আগামী দশ বছরের মধ্যে যে কোন প্রকার যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকবে।
৩. আগমনকালে মুসলিমগণ শুধু আত্মরক্ষার জন্য কোষবদ্ধ তরবারি ব্যতীত অন্য কোনো অস্ত্র সঙ্গে আনতে পারবে না।
৪. আরবদের যে কোনো গোত্রের লোক হযরত মুহাম্মদ (সা.) অথবা কাফিরদের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে কোনো বাধা নিষেধ থাকবে না।
৫. চুক্তির মেয়াদকালে জনসাধারণের পূর্ণ নিরাপত্তা রক্ষিত হবে এবং একে অপরের ক্ষতিসাধন করবে না। কোনো প্রকার লুণ্ঠন অথবা আক্রমন চলবে না।
৬. কোনো মক্কাবাসী মদিনায় আশ্রয় গ্রহণ করলে মুসলিমগণ তাকে আশ্রয় দিতে পারবে না। পক্ষান্তরে কোনো মুসলিম মদিনা থেকে মক্কায় আগমন করলে মক্কাবাসী তাকে প্রত্যাপর্ণ করতে বাধ্য থাকবে না। এছাড়া কোন নাবালক তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে মুসলিমদের দলে যোগদান করতে পারবে না; হজ্জের সময় মুসলিমদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা হবে।
৭. মক্কার বণিকগণ নির্বিঘ্নে মদিনার পথ ধরে সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করতে পারবে।
৮. এ সন্ধি চুক্তি ১০ বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।
৯. সন্ধির শর্তাবলি উভয়পক্ষকেই পরিপূর্ণভাবে পালন করতে হবে।

সন্ধির গুরুত্ব ও তাৎপর্য

হুদায়বিয়ার সন্ধির তাৎপর্য আলোচনা করলে প্রতীয়মান হবে, এতে বিধর্মী ও মুসলিমদের মধ্যে অন্ততপক্ষে দশ বছরের জন্য নিরবচ্ছিন্ন শান্তি রক্ষার প্রচেষ্টা করা হয়। যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবে কুরাইশ ও হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সদিচ্ছা প্রকাশ পায়। কারণ কুরাইশরাও যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এ সন্ধির ফলে তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। ব্যবসায়-

বাণিজ্যে অবাধ গতিবিধির নিশ্চয়তা লাভ করে কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে-এর মহানুভবতা ও দূরদর্শিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এতে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ঃ আপতদৃষ্টিতে হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলিমদের জন্য অপমানজনক মনে হতে পারে, সাহাবায়ে কেরামও তাই মনে করেছিলেন। কারণ এতে মুসলিমদের স্বার্থ পুরোপুরি রক্ষিত হয়নি। উমর (রা.) এর মধ্যে এ বিষয়ে চরম প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গিয়েছিল, কিন্তু দূরদৃষ্টিতে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর এ সন্ধিচুক্তি মুসলিমদের অনুকূলে অনুভব করতে পেরেছিলেন। এ সন্ধির পরবর্তী সুফল লক্ষ্য করলেই এর সার্থকতা স্পষ্টরূপে ফুটে উঠে।

একটি শর্ত প্রত্যাহার ঃ আবু বশির নামে একজন মুসলিম পালিয়ে মদিনায় গিয়েছিল। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকেও ফেরত দিয়ে দেন, কিন্তু সে পরে ছুটে গিয়ে সিরিয়ার পথে ঈস পাহাড়ে আত্মগোপন করে। আবু বশিরের খবর শুনে মক্কার নির্যাতিত অনেক মুসলিম তার সাথে যোগদান করেন। তারা সিরিয়াগামী মক্কাবাসীদের ওপর আক্রমণ চালাত। এভাবে তাদের ভয়ে শেষ পর্যন্ত মুসলিমদের ফেরত দেযার শর্তটি কুরাইশরা প্রত্যাহার করে নেয়।

পুরুষদের ফেরত দান ঃ সন্ধির শর্তে মক্কা থেকে আগত মুসলিমদের মদিনায় বসবাসের অনুমতি ছিল না, কিন্তু শর্তটি শুধু পুরুষদের বেলায় প্রযোজ্য ছিল, নারীদের বেলায় নয়। অতএব মক্কা থেকে কোনো নারী মদিনায় গেলে পরীক্ষা করে তাকে বসবাস করতে দেয়া হতো। মুসলিম নারীদের আশ্রয় দেয়া শুরু হলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তার জন্য কুরাইশরা পুরুষদের বিরুদ্ধে আরোপিত শর্তটিও তুলে নেয়।

যাতায়াত ও ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার ঃ হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলে মক্কা ও মদিনার মধ্যে যাতায়াত নিরাপদ হয় এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

মদিনা রাষ্ট্রের অগ্রগতি ঃ হোদায়বিয়ার সন্ধির পরে মদিনার নগর রাষ্ট্র আরবের একটি বিশাল রাষ্ট্রে রূপ নিতে শুরু করে এবং মদিনা সরকার একটি কেন্দ্রীয় সরকারে পরিণত হওয়ার দিকে এগিয়ে যায়।

নিরাপত্তা লাভ ঃ হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলে মদিনা সরকার সাময়িকভাবে একটি নিরাপদ সময় পায় এবং এ সময়টায় আন্তর্জাতিক যোগাযোগের দিকে মনোনিবেশের সুযোগ ঘটে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইসলাম ঃ এ সময়ই রোম সম্রাট, পারস্য সম্রাট, মিসর ও আবিসিনিয়ার শাসনকর্তা, বিভিন্ন অঞ্চলের স্বাধীন ও করদ রাজাদের নিকট পত্র যোগাযোগ শুরু হয়। ফলে ইসলাম আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিতি লাভ করে। এগুলো সবই হুদায়বিয়ার সন্ধির পরোক্ষ ফল।

মুসলিমদের মর্যাদা বৃদ্ধি ঃ ঐতিহাসিক পি.কে হিট্টি বলেন, "এ সন্ধির ফলে মুসলিমদের রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং প্রথম বারের মতো কুরাইশরা তাদের একটি স্থায়ী রাজনৈতিক শক্তিরুপে লিখিতভাবে স্বীকার করে নেয়।"

কুরাইশদের ক্ষমতা হ্রাস ঃ হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলে কুরাইশদের শক্তি দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে। এ সন্ধি সম্পর্কে ঐতিহাসিক যুহরী বলেন, æThere was no man of sense and judegment amongst the idolators who not led thereby go to join Islam."

রাজনৈতিক বিজয় ঃ ঐতিহাসিক ইমামুদ্দিন বলেন, "হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলিমদের একটি স্থায়ী রাজনৈতিক মর্যাদা প্রদান করে এবং কুরাইশরা মুসলিমদের একটি স্বতন্ত্র ধর্মীয় রাজনৈতিক শক্তিরূপে স্বীকার করে নেয়।"

মদিনা রাষ্ট্রের সংহতি ঃ হিজরতের পর পরই মদিনা সনদ প্রণয়নের মাধ্যমে রাসূল (সা.) মদিনা রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির ফলে একদিকে এ রাষ্ট্র শক্তিশালী প্রতিপক্ষ কাফিরদের স্বীকৃতি লাভ করে, অপরদিকে এর শক্তি সুসংহত হয়।

কূটনৈতিক বিজয় ঃ এ সন্ধির অন্যতম শর্ত 'মক্কার লোক মদিনায় গেলে তাকে ফেরত দিতে হবে'- পরবর্তীকালে মক্কাবাসীর ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দেয়। ফলে এ শর্তটি বাতিলের জন্য তারাই আবেদন জানায়। এভাবে মুসলিমগণ কূটনৈতিক বিজয় লাভ করেন।

মহানবী (সা.) এর নেতৃত্বের স্বীকৃতি ঃ ইসলামের ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধির গুরুত্ব অপরিসীম। এ সন্ধিতে কুরাইশগণ মুসলিমদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্রশক্তি বলে লিখিতভাবে মেনে নেয় এবং সর্বপ্রথম মদিনা প্রজাতন্ত্রকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং মুহাম্মদ (সা.) কে এর নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

ইসলামের ছায়াতলে জনতা ঃ ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, "এ সন্ধির মাঝখানে পূর্ণ এক বছর যেতেই দশ হাযার মুজাহিদসহ মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং মুসলিমগণ তাদের গড়া ইসলামী প্রজাতন্ত্রের স্বীকৃতি পেয়ে স্বাধীনভাবে বসবাস করার সুযোগ লাভ করেন।"

সুদূরপ্রসারী ফল ঃ এতদিন পর্যন্ত মুসলিম এবং কাফিরদের মধ্যে পারস্পরিক মেলামেশা ছিল না। সন্ধি হয়ে যাওয়ায় তাদের যোগাযোগ আরম্ভ হয়। বংশগত এবং বাণিজ্যিক সম্পর্কের দরুণ কাফিররা মদিনায় এসে মাসের পর মাস অবস্থান করতে থাকে। মুসলিমদের সাথে ওঠাবসার কথাবার্তায় ইসলামের আলোচনা প্রসারিত হতে থাকে। মুসলিম মাত্রই ছিলেন

আন্তরিক, সদাচার, সদ্ব্যবহার ও সচ্চরিত্রতার প্রতীক। মুসলিমদের মধ্য থেকে যাঁরা মক্কায় যেতেন তাদের প্রত্যেকের উপযুক্ত গুণাবলি প্রকাশ পেত।

মক্কা বিজয় ঃ কুরাইশরাই সর্বপ্রথম হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি উপেক্ষা করেছিল। তার ফলস্বরূপ হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কা বিজয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং অষ্টম হিজরী মোতাবেক ৬৩০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এক রকম বিনা যুদ্ধে মক্কা জয় করেন।

ফাতহুম মুবীন (সুস্পষ্ট বিজয়)ঃ হুদায়বিয়ার সন্ধিকে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে 'ফাত্হুম্ মুবিন' বা সুস্পষ্ট বিজয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। পবিত্র কুরআনের সূরা ফাতহের প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে- إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি। সত্যিই এটা ফাতহুম মুবীন ছিল। মুহাম্মদ (সা.) কে প্রত্যাখ্যান করার মধ্য দিয়ে অলক্ষ্যে তারা এই প্রথম তাঁকে এক অপারাজেয় শক্তিরূপে মেনে নেয়। হুদায়বিয়ার সন্ধিতে স্বাক্ষর প্রকৃতপক্ষে তাদের আত্মসমর্পনের স্বাক্ষর। কুরাইশদের এটাই নিশ্চিত পরাজয়ের পূর্বাভাস।

শিক্ষার্থীর কাজ	হুদাইবিয়ার সন্ধির পরিচয় লিপিবদ্ধ করুন।

হুদাইবিয়ার কিসের নাম?	হিজরী কত সালে এ সন্ধি হয়?	এ সন্ধিতে স্বাক্ষরকারী দুপক্ষে ব্যাক্তিদ্বয়ের নাম কী?	হুদাইবিয়ার সন্ধির কথা কোন সূরায় বলা হয়েছে ?

সারসংক্ষেপ :

হুদাইবিয়ার নামক কূপের নিকটবর্তী স্থানে মক্কার কুরাইশ কাফির ও মুসলিমদের মধ্যে যে সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়, তাই হুদাইবিয়ার সন্ধি। কাফিরদের হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রটনার বিরুদ্ধে মুসলিমরা মহানবী (সা.) এর নেতৃত্বে প্রতিশোধ গ্রহনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলে কুরাইশরা ভয় পেয়ে যায়। তারা সম্ভাব্য আক্রমণের ভয়ে মুসলিমদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার আকাঙ্খা ব্যক্ত করলে মহানবী (সা.) তা মেনে নেন। উমরা করতে না পারা, কুরাইশ কাফিরদের বাড়াবাড়ি ও প্রতারণা সত্বেও মহানবী (সা.) উক্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে রাজী হন। আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের শপথগ্রহণে এতই খুশি হন যে, তিনি কুরআনুল কারীমে এ চুক্তিকে 'ফাত্হুম্ মুবিন' বা 'স্পষ্ট বিজয়' বলে অভিহিত করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৬

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়?
(ক) ৬২৪ (খ) ৬২৫ (গ) ৬২৭ (ঘ) ৬২৮

২. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিধর্মী কুরাইশদের মন জয় করেন-
i. উদারতা দিয়ে; ii. মহানুভবতা দিয়ে; iii. ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

৩. হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে অর্জিত হয়-
i. মদিনা রাষ্ট্রের স্বীকৃতি; ii. দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের অবসান; iii. শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদের ইসলাম গ্রহণ।
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও iii (খ) ii ও iii (গ) i ও ii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

নানাবিধ কারণে সংখ্যালঘু দলের নেতা আজমতউল্লাহ নিজ দেশ ছেড়ে স্বীয় অনুসারীদের নিয়ে অন্য দেশে আশ্রয় নেন। পরবর্তীতে নিজ দেশে ফিরে আসলে উগ্রপন্থীদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন। ফঠেল তিনি উগ্রপন্থীদের সাথে আলোচনা ও সমঝোতা সাপেক্ষে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। আপাত দৃষ্টিতে উক্ত সন্ধি সংখ্যালঘুদের প্রতিকুলে মনে হলেও পরবর্তীতে তা অনুকুল বলে প্রতিফলিত হয়।

(ক) হুদাইবিয়ার সন্ধির কার্যাবলীকে সম্পাদন করেন? ১
(খ) বায়তুর বিদরওয়ান কী? ২
(গ) উদ্দীপকের সন্ধির সঙ্গে তোমার পঠিত কোন সন্ধির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করুন। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের আলোকে উক্ত সন্ধির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৪.৭ মক্কা বিজয় (৬৩০ সাল)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আপনি মক্কা বিজয়ের ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- মক্কা বিজয়ের কারণ ও এর সুদূর প্রসারী ফলাফল জানত পারবেন ও
- মক্কা বিজয়ের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**মক্কা বিজয়, বনী বকর গোত্র, বনী খুযায়া গোত্র ও রক্তপণ**

মক্কা বিজয়ের পটভূমি

হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত ছিল আরবের অন্যান্য জাতি সম্প্রদায় তাদের ইচ্ছামতো মুসলিম অথবা কুরাইশ যে কোনো পক্ষের সাথে মিত্রতা স্থাপন করতে পারবে। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর দু'বছর কেটে অষ্টম হিজরীর রমযান আসল। সন্ধি মোতাবেক আরব গোত্রসমূহের মধ্য থেকে বনী খুযায়া গোত্র রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে এবং তাদের শত্রুপক্ষ বনী বকর কুরাইশদের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এ দু'গোত্রের মধ্যে বহুদিন যাবৎ যুদ্ধবিগ্রহ চলে আসছিল। ইসলাম বিকাশের ফলে আরবরা মুসলিমদের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। কাজেই এ সময় তাদের পারস্পরিক লড়াই-সংঘাত বন্ধ থাকে। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। বনী বকর গোত্র তখন মনে করল, এখন প্রতিশোধ নেয়ার সময় এসেছে। তারা আকস্মাৎ বনী খুযায়ার ওপর আক্রমণ করে বসে। এতে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ যুদ্ধসম্ভার দিয়ে তাদের সাহায্য করে। ইকরামা ইবনে আবু জাহল, সাফওয়ান বিন উমাইয়া, সোহায়ল ইবনে আমর প্রমুখ রাত্রির অন্ধকারে মুখোশ পরে বনী বকরের সাথে যোগদান করেছিল। বনী খুযায়া অনন্যোপায় হয়ে হারাম শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করে। হারাম শরীফের মর্যাদা রক্ষা জরুরি মনে করে বনী বকর বিরত হয়, কিন্তু নওফেল বলল, "এরূপ সুবর্ণ সুযোগ আর মিলবে না।" শেষ পর্যন্ত হারামের অভ্যন্তরেই বনী খুযায়ার লোকদের হত্যা করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ ঘটনা জানতে পেরে অত্যন্ত মর্মহত হন। তিনি কুরাইশদের দূত মারফত জানিয়ে দিলেন, নিম্নলিখিত তিনটি শর্তের কোনটি তোমরা মেনে নেবে জানতে চাই? শর্ত তিনটি হলো-

১. যুদ্ধে নিহতদের রক্তপণ (দিয়াত) দেয়া হোক।
২. কুরাইশ বনী বকরকে সাহায্যদান থেকে বিরত হোক।
৩. অথবা হুদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল ঘোষণা করা হোক।

তখন কুরাইশ পক্ষ থেকে কুরতা বিন উমর ঘোষণা করল, আমরা তৃতীয় শর্ত মেনে নিলাম, কিন্তু দূত চলে যাওয়ার পর কুরাইশদের বোধোদয় হয়। তারা আবু সুফিয়ানকে হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি নতুন করে স্বাক্ষর করার জন্য দূত হিসেবে পাঠায়। কিন্তু মুসলিমগণ তা মেনে নেয়নি।

মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি

রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। অষ্টম হিজরী সনের ১৮ রমযান রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রায় দশ হাজার অনুরক্ত ভক্ত সাথে নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। মুসলিম বাহিনী যথাসময়ে মক্কার নিকটবর্তী মাররুয যাহরান উপত্যকায় উপস্থিত হয়ে শিবির স্থাপন করে। আরবদের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা.) সেনাবাহিনীকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আগুন জ্বালাবার নির্দেশ দেন, তাতে সমগ্র মরুভূমি ঝলমল করে ওঠে। কুরাইশ প্রধানগণ এ দৃশ্য দেখে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের জন্য হাকিম বিন হিযাম, আবু সুফিয়ান ও বুদায়লকে পাঠায়। তাঁবু প্রহরারত মুসলিম সৈন্যরা আবু সুফিয়ানকে ধরে ফেললেন। তাকে বন্দি করা হয়। পরে আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর মহানবী (সা.) আবু সুফিয়ানকে বললেন- আবু সুফিয়ান, তুমি গিয়ে মক্কাবাসীদের অভয় দাও- আজ তাদের প্রতি কোনোই কঠোরতা করা হবে না। তুমি আমার পক্ষে নগরময় ঘোষণা করে দাও-

১. যারা আত্মসমর্পণ করবে,
২. যারা কাবায় প্রবেশ করবে,
৩. যারা নিজেদের গৃহদ্বার বন্ধ করে রাখবে, অথবা
৪. যারা আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, তাদের অভয় দেয়া হলো।

মক্কায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (সা.) হনুজ নামক স্থানে ঝাণ্ডা উড্ডীন করতে এবং সৈন্যদের নিয়ে হযরত খালিদ (রা)-কে উচ্চভূমির দিকে অগ্রসর হওয়ার আদেশ করেন। মহানবী (সা.) মুসলিম বাহিনীর উদ্দেশ্যে বলেন, যতক্ষণ কেউ তোমাদের সাথে লড়াই না করবে, তোমরাও লড়াই করবে না। কুরাইশদের থেকে ইকরামা ও সাফওয়ান তীর নিক্ষেপ আরম্ভ করে। এতে কুরয ইবনে জাবির ফিহরী ও কুনায়স ইবলে খালিদ ইবনে রবিয়া শহীদ হন। হযরত খালিদ প্রতিশোধ গ্রহণ আরম্ভ করলে যুদ্ধ বেঁধে যায়। এতে ৭০ জন কাফিরকে হত্যা করে ফেলেন।

বায়তুল্লায় প্রবেশ ও সালাত আদায় ঃ রাসুলুল্লাহ (সা.) আনসার ও মুহাজিরদের নিয়ে মসজিদে হারাম বায়তুল্লায় প্রবেশ করলেন। ভক্তিভরে তার চারপার্শ্বে তাওয়াফ করলেন ও হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন। হযরত উমর ও আলী (রা:) কে বায়তুল্লাহ হতে ৩৬০ টি মূর্তি অপসারণ করে কাবাঘর পবিত্র করতে আদেশ দিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) কাবাঘরে প্রবেশ করে দু'রাকাত সালাত আদায় করলেন ও তাকবিরের ধনিতে বায়তুল্লাহ মুখরিত হল। অতঃপর তিনি কাবাঘরের দরজা খুললেন।

মক্কা বিজয়ের গুরুত্ব

ইসলামের বিজয় ঃ সুদীর্ঘ একুশ বছর ধরে মুসলিমরা কুরাইশদের যে অত্যাচার, অবিচার, উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করে আসছিলেন, এদিন তার পরিসমাপ্তি ঘটে। রক্ত দ্বারা নয়, মহানবী (সা.) প্রেম দ্বারা মক্কা বিজয় সম্পন্ন করেন। এরূপ রক্তপাতহীন বিজয় দুনিয়ার ইতিহসে নজিরবিহীন। মক্কা বিজয়ের অর্থই হচ্ছে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ইসলামের জয়। কেননা মক্কাই তখন ছিল পৌত্তলিকতার কেন্দ্রস্থল। অন্যদিকে এ বিজয় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে এমন এক উচ্চাসন প্রদান করে, যার স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে তিনি আরব উপদ্বীপের একচ্ছত্র অধিপতি হলেন। মক্কা বিজয়ের স্বাভাবিক পরিণতিই হলো সমগ্র আরবে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা। মক্কা বিজয়ের অন্যান্য সুফল নিম্নরূপ-

১. আরব উপদ্বীপে মিল্লাতে ইবরাহীম প্রতিষ্ঠা হয়।
২. গোটা আরব দেশ মদিনার ইসলামী সরকারের অধীনে আসে।
৩. আরবের যে সকল গোত্র এত দিন পর্যন্ত ইসলাম বোঝেনি তারাও ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে পৌত্তলিকতার পক্ষে কথা বলার কেউ থাকল না।
৪. আরব উপদ্বীপে ইসলাম ছাড়া অপর কোনো ধর্মের অস্তিত্ব থাকেনি। অবশ্য এ অবস্থা হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে আরো ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়।
৫. কাবা শরীফ তথা মসজিদুল হারাম এলাকা চিরকালের জন্য অমুসলিমদের আওতার বাইরে চলে যায়।
৬. মক্কা বিজয়ের ফলে মুসলিমদের চিরকালের জন্য হজ্জ, উমরা ও তাওয়াফের সুযোগ সৃষ্টি হয়। মক্কা বিজয়ের পর আজ পর্যন্ত এ তিনটি কাজ কোনো সময়েই ব্যাহত হয়নি।

ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, "এ বিজয়ের ফলে মুসলিম হৃদয় বিশ্ব জয়ের ধারণা ও শক্তি সঞ্চয় করে এবং মহানবী (সা.) পরবর্তীতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে দূত প্রেরণ করতে সক্ষম হন।"

মক্কা বিজয় কী আক্রমণাত্মক?

ক. সন্ধিমূলক বিজয় ঃ ঐতিহাসিক ও ইসলামী চিন্তাবিদদের একাংশ মনে করনে, মক্কা বিজয় সন্ধির মাধ্যমে হয়েছিল; যুদ্ধের মাধ্যমে নয়। তাঁরা যুক্তি দেখিয়েছেন-

১. মক্কা বিজয়ে দিন মহানবী (সা.) মক্কার লোকদের বিভিন্নভাবে নিরাপত্তা দান করেন। আবু সুফিয়ানের সাথে পূর্বেই আলোচনার মাধ্যমে মহানবী (সা.) ঘোষণা করেছিলেন-
২. তদুপরি কোনো এলাকা যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হলে সে এলাকার ভূমি মুসলিম মুজাহিদের মাঝে বণ্টন দেয়া হয়। অথচ মক্কা বিজয়ের পর তা করা হয়নি। এতে প্রমাণিত হয়, যুদ্ধ নয়; বরং সন্ধির মাধ্যমেই মক্কা বিজিত হয়েছিল।

খ. আক্রমণাত্মক বিজয় ঃ ঐতিহাসিক এবং ইসলামী পণ্ডিতদের অধিক সংখ্যক মনে করেন, মক্কা আক্রমণাত্মক যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হয়েছিল। তারা যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন, এ বিজয় অর্জন করতে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)-এর নেতৃত্বাধীন বাহিনী যুদ্ধ করে প্রায় ৭০ জন কাফিরকে হত্যা করেছিলেন। যুদ্ধ না হলে এমনটা হতো না। তবে এ অভিমত দুর্বল; বরং পূর্বোক্ত মতই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

পরিশেষে বলা যায়, মক্কা বিজয় শুধু ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনাই করেনি; বরং এ বিজয় একটি সুবিশাল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রযাত্রা। এ বিজয়ের মধ্য দিয়ে মক্কা তাওহীদের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তাই

ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন- That through all the annals of conquest there has been no triumphant entry like unto this one.

শিক্ষার্থীর কাজ	মক্কা বিজয় সম্পর্কে ধারণা দিন।

হিজরীর কত সালে মক্কা বিজয় সংঘঠিত হয়?	কোন ঘটনা মক্কা বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণ?	কুরাইশরা কাবাঘরে কতটি মূর্তি স্থাপন করেছিল?	মক্কা বিজয়ের পূর্বে কোন ঘোরতর শত্রু ইসলাম গ্রহণ করে?

সারসংক্ষেপ :

এ সে মহান বিজয় যে বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীন, রাসুলুল্লাহ, মুজাহিদ বাহিনী ও দ্বীনের আমীনদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন। ইহা ছাড়া মক্কা শহর ও কাবা ঘরকে দুনিয়ার মানুষের জন্য হিদায়াতের বস্তুতে পরিণত করেছিলেন। কাফির ও মুশরিকদের হাত হতে এ ঘরকে মুক্ত করেছিলেন। এ মহান বিজয়ের ফলে আসমানের বাসিন্দাদের মধ্যে সুসংবাদ ও আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। এ বিজয়ে আল্লাহর মনোনীত দ্বীনে ইসলামে লোকেরা দলে দলে প্রবেশ করতে লাগল। মহানবী (সা.) কোনরকম প্রতিশোধ গ্রহনের ইচ্ছার পরিবর্তে মক্কার শত্রুদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। তাই মক্কা বিজয় একটি রক্তপাতহীন বিজয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৭

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মহানবী (সা.) কোন বিজয়ের পর সকলকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষনা করেন?
   (ক) বদর যুদ্ধের (খ) খন্দক যুদ্ধের
   (গ) হুদায়াবিয়ার সন্ধির (ঘ) মক্কা বিজয়ের

২. কোন ঘটনার পর কাবা ঘর থেকে ৩৬০ টি মূর্তি অপসারণ করা হয়
   (ক) হিজরতের পর (খ) মক্কা বিজয়ের পর
   (গ) বদর যুদ্ধের পর (ঘ) কোনটিই নয়

৩. বিশ্ব ইতিহাসে রক্তপাতহীন বিজয় কোনটি
   (ক) হিজরত (খ) মক্কা বিজয়
   (গ) বদর যুদ্ধ (ঘ) কোনটিই নয়

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

প্রাচীন কালে 'ক' রাজ্যে একজন সত্যবাদী ও জন নন্দিত নেতার আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে আহবান জানান। এতে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠি তাকে ও তার অনুসারীদের সে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে। তাদের অনেককে হত্যা করে। ফলে তারা দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়। অনেক বছর পর আশ্রিত রাজ্যের আরো অনেক লোকসহ তারা স্বদেশে ফিরে আসে। 'ক' রাজ্যের জনগণ এতে খুবই আতংকিত হয়। কিন্তু সে মহান নেতা সকলকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে ভালোবাসায় বুকে জড়িয়ে নেন।

(ক) কত সালে মক্কা বিজয় হয়? ১
(খ) হাজরে আসওয়াদ কী? ২
(গ) উদ্দীপকের ঘটনাটি হযরত মোহাম্মদ (স:) এর কোন ঘটনাটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) 'মক্কা বিজয় ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র রক্তপাতহীন বিজয়'- উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

পাঠ-৪.৮ হুনায়ুনের যুদ্ধ (৬৩০ খ্রি. ৮ম হিজরী)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হুনায়ুনের যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**হুনাইন, বনু সাকিফ, বনু হাওয়াযেন, মালেক ইবনে আওফ, নাজরানের খ্রীস্টান, সানাতুল অফূদ, যেমাম ইবনে সালাবা ও তায়েফ দূর্গ**

হুনাইনের যুদ্ধ

মক্কা বিজয়ের পর অবশিষ্ট সমগ্র কুফরি শক্তি আরো একবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলিমদের পতনের প্রচেষ্টা চালায়। তায়েফের হাওয়াযেন ও সাকিফ গোত্র এতে নেতৃত্ব দেয়। তাদের সংগঠিত বিশ হাজার সৈন্য মুসলিমদের বিরুদ্ধে রণপ্রস্তুতি গ্রহণ করে। অষ্টম হিজরীর শেষভাগে হুনাইন প্রান্তরে তাদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ হয়। ইতিহাসে এটাই হুনাইনের যুদ্ধ নামে খ্যাত।

হুনাইন যুদ্ধের কারণ

ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, "মক্কা বিজয়ের পর কাবা গৃহ মুসলিমদের হাতে চলে যায়। ফলে কাবা গৃহে সংরক্ষিত প্রতিমাগুলো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে উৎখাত হয়। এ ঘটনা কাফিরদের কাছে অসহ্য ছিল। তাই তারা গোপনে গোপনে কাবা ঘর পুন: দখলের চেষ্টা করছিল।" বনু সাকিফ, বনু হাওয়াযেন, বনু জুযাম, বনু নাসর ও বনু সাদ গোত্রসহ বেশ কিছু গোত্র মন থেকে প্রতিমা পূজার মায়া ত্যাগ করতে পারছিল না। বিশেষ করে বনু সাকিফ ও বনু হাওয়াযেন গোত্রদ্বয় তাদের পৌত্তলিকতা ও নিজেদের সম্মান রক্ষার জন্য মালেক ইবনে আওফের নেতৃত্বে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মক্কার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত তায়েফের নিকটবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে তাদের বসতি ছিল। তারা নানা শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হয়েছিল। কুরাইশদের ন্যায় তারাও ছিল পৌত্তলিক। মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত নানাভাবে তারা আরবের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিরুদ্ধে সাহায্য করে আসছিল। এতদিন মক্কা ছিল কুরাইশদের হাতে। তাই তারা নিজেদের নিরাপদ মনে করতো, কিন্তু যখন দেখল মুহাম্মদ (সা.) মক্কা জয় করে নিয়েছেন এবং কুরাইশ ও অন্যান্য পার্শ্ববর্তী গোত্রও ইসলাম গ্রহণ করেছে, তখন তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ বিপদাপন্ন দেখতে পায়। মুসলিম বাহিনী তাদেরও আক্রমণ করতে পারে- এ আশঙ্কায় তারা কালবিলম্ব না করে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের আয়োজন শুরু করে। তায়েফের বনু সাকিফ গোত্রও হাওয়াযিনদের সাথে যোগ দিয়ে কালবিলম্ব না করে তা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, "বেদুইন পৌত্তলিক গোত্রগুলো মুসলিমদের বিনাশ সাধনের মাধ্যমে বাণিজ্য সুবিধাসহ যাবতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে একচেটিয়া প্রাধান্য বজায় রাখার অপপ্রয়াস চালিয়েছিল।" সর্বোপরি, মুসলিমদের সার্বিক উন্নতি দেখে বেদুইন গোত্রগুলো বুঝতে পেরেছিল, তাদের মুসলিমদের কাছে হয়তবা আত্মসমর্পণ করতে হবে। এরূপ আশঙ্কা বোধ করে তারা মুসলিমদের ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

হুনাইন যুদ্ধের ঘটনা

এ সংবাদ মহানবী (সা.)-এর নিকট আসলে তিনি বনু সাকিফ ও হাওয়াযিনের আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে হুনাইন উপত্যকায় বারো হাজার সৈন্য সমাবেশ করেন। শত্রু সৈন্যরা হুনাইন উপত্যকায় সমবেত হয়েছিল। এবার মুসলমনাদের সংখ্যা শত্রু সংখ্যা থেকে অধিক। তারা সর্বমোট ছিল বারো হাজার, তন্মধ্যে দশ হাজার মুহাজির। যুদ্ধের প্রথমদিকে পাহাড়ের উপত্যাকা ও চূড়া থেকে অতর্কিত আক্রমণ করে মুসলিমদের নাজেহাল করে। যদি না আল্লাহর সাহায্য আসতো, তবে এ যুদ্ধে মুসলিমরা পরাজয়ের গ্লানি বরণ করে নিতে বাধ্য হত। অবশেষে মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের বীরত্বে মুসলিমরা জয়লাভ করে।

হুনাইন যুদ্ধের ফলাফল

ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, "এ যুদ্ধে কাফিরদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। ৭০ জন কাফির নিহত আর ৬,০০০ জন বন্দী হয়। এ যুদ্ধে পরাজয় বরণের পর কাফিররা হতোদ্যম হয়ে পড়ে।" এ যুদ্ধে কাফিরদের অজস্র অস্ত্রশস্ত্রসহ ২৪,০০০ উট এবং ৪১,০০০ তোলা স্বর্ণ-রৌপ্য মুসলিমদের হাতে চলে যায়। অপর পক্ষে ৪ জন অথবা ৫ জন মুসলিম মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন।" কাফিরদের শেষ অহংকারটুকুও এ যুদ্ধে বিলীন হয়। কারণ ২০ হাজার কাফির তাদের সৈন্যসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মুসলমানের কাছে এবারও পরাজিত হয়। এ যুদ্ধে মুসলিমদের জয়লাভ করার পর পরাজিত শত্রুর অনেকেই তায়েফ দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে প্রতিশোধ গ্রহণ করার পরিকল্পনা করে। মহানবী (সা.) আবু মুসার নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করলে তায়েফবাসী আত্মসমর্পন করে।

আরব গোত্রসমূহের রাসূলের দরবারে আগমন

মক্কা বিজয় পরবর্তী হুনাইনের বিজয়ের পর বিভিন্ন গোত্র থেকে দূত দল এসে মদিনায় ইসলাম কবুল করে অথবা নিজেদের লোকালয়ে মুসলিম হয়ে মদিনায় এসে তাঁর অনুমোদন নেয়। কোনো কোনো দূত দল রাজনৈতিক চুক্তির জন্য আসে, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করে। কেউ কেউ মুসলিম না হয়েই ফিরে যায়; পরে ইসলাম গ্রহণ করে।

সানাতুল অফূদ ঃ নবম হিজরীতে দূত দল আগমন শুরু হয়। এজন্য এ বছর ইতিহাসে 'সানাতুল অফূদ' বা 'দূত দল আগমনের বছর' নামে খ্যাত। এ দূত দলের সংখ্যা একশর ওপর ছিল। দু'চারটি ছাড়া অধিকাংশ দলই মক্কা বিজয়ের পর নবম হিজরীতে এসেছিল। এদের মধ্যে দু'একজন বাদে সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। নিম্নে কয়েকটি বিখ্যাত দূত দল সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

সাকিফ গোত্রের দূত দল ঃ তাবুক অভিযানের পরে সাকিফ গোত্রের দূত দল মহানবী (সা.)-এর দরবারে আগমন করে। তিনি মসজিদে নববীর নিকট তাদের তাঁবু খাটানোর ব্যবস্থা করে দেন, যাতে তারা কাছে থেকে মুসলিমদের দেখতে এবং কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পায়। কয়েকদিন মদিনায় থাকার পর এ দূত দল ইসলাম গ্রহণ করে। মহানবী (সা.) উসমান ইবনে আবুল আসকে তাদের ইমাম নিযুক্ত করেন।

বিভিন্ন গোত্রের দূত দলের আগমন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) একদিন মসজিদে নববীতে বসে ছিলেন, এ সময় বনী সাদ গোত্রের নেতা যিমাম ইবনে সালাবা উষ্ট্রে আরোহণ করে মসজিদের একেবারে দরজায় এসে বাহন থেকে নেমে সরাসরি মজলিসে আসে এবং জিজ্ঞেস করে, আবদুল মুত্তালিবের পুত্র কে? সাহাবগণ মহানবী (সা.)-এর দিকে ইঙ্গিত করেন। তখন সে মহানবী (সা.)-কে বলল, "আপনার নিকট আমার কয়েকটি প্রশ্ন রয়েছে।" মহানবী (সা.) বললেন, যে ধরণের প্রশ্নই হোক জিজ্ঞেস করুন। অতঃপর তাঁকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করা হলে তিনি তার সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করেন। এতে সে তখনই ইসলাম গ্রহণ করে গোত্রে ফিরে গিয়ে সমগ্র গোত্রকে ইসলামে দীক্ষিত করে নেয়। এভাবে ইসলামের প্রসার হতে থাকে। এরপর ক্রমান্বয়ে বনু ফাযারা, বনু তামিম, বনু আবদুল কায়স, বনু হানিফা, বনু কাহতান এবং বনু হারিস প্রমূখ গোত্রসমূহ ইসলাম গ্রহণ করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	হুনাইন যুদ্ধের ঘটনাবলী বিবৃত করুন।

কত সালে হুনাইনের যুদ্ধ সংঘঠিত হয়?	হাওয়াযিন গোত্রের নেতার নাম কী?	'সানাতুল-অফুদ' অর্থ কী?	হুনাইনের যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমাতের তালিকা লিখ?

সারসংক্ষেপ :

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন ছিল বিধর্মী কাফিরদের নানা ষড়যন্ত্র ও অত্যাচারে আকীর্ণ। মহান আল্লাহর তায়ালার মনোনীত দ্বীন ইসলামকে প্রচারের জন্য কাজ করতে গিয়ে শত্রুর ব্যপক বাধার সাথে সাথে আল্লাহর সাহায্য ছিল অনেক। মুসলিমদের জেহাদের ময়দানে অবিচল থাকার ফলে সরাসরি আল্লাহর যে সকল সাহায্য এসেছিল, হুনাইনের যুদ্ধ তাদের মধ্যে অন্যতম। মক্কার নিকটবর্তী গোত্রসমূহ এ যুদ্ধের অব্যাহতি পরে ইসলামের ছায়াতলে আত্মসমর্পন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৮

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোন ঘটনার পর হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়?
(ক) বদর যুদ্ধের (খ) খন্দক যুদ্ধের
(গ) হুদায়াবিয়ার সন্ধির (ঘ) মক্কা বিজয়

২. কোন ঘটনার পর আরব গোত্রসমূহ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আসে?
(ক) ওহুদ যুদ্ধের (খ) খন্দক যুদ্ধের
(গ) হুদায়াবিয়ার সন্ধির (ঘ) হুানাইনের যুদ্ধ

৩. হুনাইনের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়?
(ক) ৬৩০ (খ) ৬২৯
(গ) ৬২৮ (ঘ) ৬২২

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

অভিযান ও যুদ্ধ	মক্ক বিজয়:৬৩০ সাল	----------যুদ্ধ: ৬৩০ সাল	তাবুক অভিযান: ৬৩০ সাল
প্রতিপক্ষ	কুরাইশ	হাওয়াজিন ও সাকিফ গোত্রদ্বয়	রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস

(ক) হুনায়ুনের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর নেতা কে ছিলেন? ১
(খ) সানাতুল অফুদ বলতে কী বুঝায়? ২
(গ) উদ্দীপকের ছকটির শূন্যস্থানে কোন যুদ্ধের ইংগিত দেয়া হয়েছে? যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করুন। ৩
(ঘ) ‘ উক্ত যুদ্ধের পরে ইসলামের প্রচার বৃদ্ধি পায় ’- উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৪.৯ মুতার যুদ্ধ ও তাবুকের অভিযান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মুতার যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- তাবুক যুদ্ধের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**তাবুক, রোম সাম্রাজ্য, শোরাহবিল বিন আমরের, হিরাক্লিয়াস, মসজিদে যেরার, মুতার যুদ্ধ, যায়েদ ইবনে হারেসা, জাফর ইবনে আবি তালিব ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা**

মুতার যুদ্ধ

মুতা শাম (সিরিয়া)-এর অন্তর্গত 'বালক' রাজ্যে সীমান্তে অবস্থিত। অষ্টম হিজরী সনের জমাদিউল উলা মাসে মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ পর্যন্ত মুসলিমদের সাথে আরব এলাকার ইহুদি ও মুশরিকদের মোকাবেলা হয়ে আসছিল। এখন রোমীয় খ্রিস্টান রাজশক্তি মুসলিম ও ইসলামের বিস্তারে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

যুদ্ধের কারণ ঃ যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, মহানবী (সা.) হারেস ইবনে উমায়র আযদীকে চিঠি দিয়ে শাম অথবা বসরায় প্রেরণ করেছিলেন। রোমকদের অধীন বসরার গভর্নর শোরাহবিল ইবনে আমর গাসসানী (যে অনেক আগে আরব থেকে খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিল) সব আন্তর্জাতিক নিয়ম লঙ্ঘন করে মুসলিম দুতকে হত্যা করে। শোরাহবিলের অন্যায় হত্যাকাণ্ডে মহানবী (সা.) অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে এ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। ইহুদিদের অব্যাহত বিরোধিতার কারণে তাদের পক্ষ থেকে কিছুটা নিশ্চিত হওয়ার পর হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তিন হাজার মুসলিম সৈন্য সেখানে প্রেরণ করেন।

রাসূল (সা.)-এর নসিহত

মুতার যুদ্ধে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা, জাফর ইবনে আবি তালিব এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে বিশেষভাবে প্রেরণ করা হয়। সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেয়া হয় হযরত হযরত যায়েদ (রা)-কে। সঙ্গে সঙ্গে মহানবী (সা.) বলেন, যায়িদ শহীদ হলে জাফর নেতৃত্ব দিবে, সে যদি শহীদ হলে জাফর ইবনে আবি তালিব, সেও যদি শহীদ হয় তবে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। মুসলিম বাহিনী প্রেরণের সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) নসীহত করেন:

১. যেসব আল্লাহর বান্দা নিজেদের ইবাদতখানায় ইবাদতে রত থাকবে, তাদের ওপর হামলা করবে না।
২. কোনো স্ত্রীলোকের প্রতি হাত বাড়াবে না।
৩. কোন শিশুকে হত্যা করবে না।
৪. কোনো বৃদ্ধ লোককে হত্যা করবে না।
৫. শস্যক্ষেত্র ও ফলবাগান ধ্বংস করবে না।

ঘটনাবলী ঃ শোরাহবিল মুসলিম বাহিনীর অভিযান সংবাদ পেয়ে এক লক্ষ সুসজ্জিত সৈন্য নিয়ে মোকাবেলা করার জন্য অগ্রসর হয়। স্বয়ং রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে প্রস্তুত ছিল। মুসলিমগণ এ সংবাদ অবগত হয়ে খানিকটা ইতস্তত বোধ করছিলেন এবং কী করা যায় ভাবতে লাগলেন। এ আলোচনায় সিদ্ধান্ত হলো, মহানবী (সা.)-কে পত্র মারফত জানানো হবে, হয়ত তিনি সাহায্য প্রেরণ করবেন অথবা যে হুকুম করবেন তা পালন করা হবে। মুসলিম বাহিনীর এ রকম মানসিক দোদুল্যমান অবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) মুসলিম সৈন্যদের বললেন, 'মুজাহিদগণ! তোমরা শাহাদাতের সন্ধানে বের হয়েছ। আজ একে কীরূপ দৃষ্টিতে দেখছ? আমরা শক্তি ও সংখ্যার ওপর নির্ভর করে যুদ্ধ করি না, আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিতে যুদ্ধ করি। দুটি পুণ্যের মধ্যে একটি তো অবশ্যই আমরা লাভ করব; বিজয় অথবা শাহাদাত। তাঁর এ বক্তৃতায় মুসলিম বাহিনী নবপ্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। সকলেই বলে ওঠেন, আবদুল্লাহ ঠিকই বলেছে। ফলে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত ক্ষুদ্র তিন হাজার সৈন্য এক লাখেরও অধিক খ্রিস্টান ফৌজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।
হযরত যায়িদ (রা) বর্শার আঘাতে শহীদ হন। হযরত জাফর (রা) তাঁর স্থান গ্রহণ করেন। তিনিও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। তাঁর এক হাত কেটে গেলে অপর হাতে ঝাণ্ডা ধারণ করেন। সেটি কেটে গেলে তিনি বাহু দ্বারা যুদ্ধ ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখেন। সর্বশেষ তিনিও শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর পর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) ইসলামের ঝাণ্ডা হাতে নেন।

তিনিও শাহাদাত বরণ করেন। হযরত আবুদল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা) শহীদ হলে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা) ঝাণ্ডা হাতে নেন। তিনি এমন বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন যে, সেদিন তাঁর হাতে নয়টি তরবারি ভেংগে যায়। সেদিনই তিনি তাঁর যুদ্ধ অভিজ্ঞতার পূর্ণ পরিচয় দেন। চূড়ান্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে আল্লাহর মেহেরবানীতে পুরো ইসলামী ফৌজকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করেন। প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে দেড় দিন পর্যন্ত তুমুল যুদ্ধের পর মুসলিম সৈন্যরা নিজেদের তুলনায় চল্লিশগুণ অধিক শত্রু সৈন্যকে ময়দান ছাড়তে বাধ্য করেন। এ যুদ্ধে শুধু বারো জন মুসলিম শহীদ হন এবং কাফিরদের পক্ষে হাযারেরও অধিক সৈন্য মারা যায়। এ যুদ্ধের পরই হযরত খালিদ (রা) 'সাইফুল্লাহ' (আল্লাহর তরবারি) খেতাবে ভূষিত হন। মুসলিম গাযিদের ফেরার পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জানিয়ে দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) মুতার যুদ্ধক্ষেত্রে পর পর তিন জন সেনাপতির শাহাদাতের খবর শোনাচ্ছিলেন আর তাঁর চক্ষু বেয়ে টপ টপ করে পানি গড়িয়ে পড়ছিল। অবশেষে তিনি বললেন, 'সাইফুম মিন সুয়ূফিল্লাহ' যুদ্ধের পতাকা বহন করেছে, আল্লাহ মুসলিমদের বিজয় দান করেছেন।

তাবুক অভিযান (৬৩০ খ্রি.)

সত্য-মিথ্যার সংঘাত পৃথিবীর ইতিহাসের চিরন্তন অনিবার্য অধ্যায়। ইতিহাসের এ রূঢ় বাস্তবতার ফলেই মহানবী (সা.)-এর ইসলামী মিশন ক্ষণিকের স্তব্ধতা নিয়ে অপশক্তির মুখোমুখি হয়েছিল। এভাবে ক্রমান্বয়ে মিথ্যার প্রচণ্ড শক্তির দপূ চূর্ণ করে বিশ্ব বিজয়ের সোপান আবিষ্কৃত হয়েছিল। ইসলামের ইতিহাসের এরূপ একটি ঘটনা হলো তাবুক যুদ্ধ। তাবুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তদানীন্তন বিশ্বের অন্যতম প্রধান সাম্রাজ্যবাদী শক্তি রোমানদের বিরুদ্ধে। হিজরী নবম সাল মোতাবেক ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে মদিনা থেকে ৪০০ মাইল দূরে সিরিয়া সীমান্তে অবস্থিত তাবুক নামক স্থানে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

তাবুক যুদ্ধের কারণ

রোম সাম্রাজ্যের অধীন সিরিয়ার শাসক শোরাহবিল বিন আমরের লক্ষাধিক খ্রিস্টান সৈন্যকে মুতার যুদ্ধে মুসলিমগণ শোচনীয়ভাবে পরাজিত করলে রোমান সম্রাট ক্ষুদ্ধ হন। ফলে তিনি মুসলিমদের সমুচিত শিক্ষা প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মুসলিম বিদ্বেষী-ইহুদি চক্র রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ প্রদান করলে তিনি এটাই নবোত্থিত মুসলিম শক্তিকে পর্যুদস্ত করার মোক্ষম সুযোগ বলে মনে করেন। রোমান সম্রাট এ মিথ্যা সংবাদে উৎসাহী হয়ে মদিনা আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

রোমানদের অভিযান ঃ ৬৩০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস মদিনা আক্রমণের বিষয়টি চূড়ান্ত করে। রোমান সাম্রাজ্যের অধীন লাখম, জুযাম, গাসসান, আমেলাহ প্রভৃতি কয়েকটি আরব গোত্রও প্রায় এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে রোমান বাহিনীতে শামিল হয়। রোমানদের যুদ্ধাভিযানের খবর পেয়ে তা প্রতিহত করা এবং সিরিয়া অভিমুখী বাণিজ্যিক পথ নিরাপদ রাখার জন্য মুসলিম মুজাহিদগণ সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হন। মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর পদাতিক সৈন্য সংখ্যা ছিল ১০,০০০, আশ্বারোহী ৩০,০০০। মদিনা থেকে ৪০০ মাইল দূরে সিরিয়া সীমান্তে অবস্থিত তাবুক নামক স্থানে মুজাহিদ বাহিনী শিবির স্থাপন করে। রোমান সৈন্যরা মুসলিমদের বিরাট আয়োজন ও শক্তিসাহস দেখে সামনে অগ্রসর হয়নি। হযরত মুহাম্মদ (সা.) সেখানে ২০ দিন অবস্থান করে রমযান মাসের মধ্যেই ফিরে আসেন।

তাবুক অভিযানের ফলাফল ঃতাবুক যুদ্ধে তদানীন্তন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তি রোমান বাহিনীর পরাজয়বরণের ফলে উত্তর আরবের সীমান্ত অঞ্চলের রোমানদের অধীনস্থ ছোট ছোট রাজ্যসমূহের প্রধানগণ মদিনা-রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে জিযিয়া কর প্রদানে সম্মত হয়। এ অভিযানের পর আরব উপদ্বীপ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জনগণ দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে।

মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ঃ মুসলিমদের মধ্যে কীভাবে কলহ-বিবাদ বাধানো যায় মুনাফিকরা সর্বদা এ চিন্তায় মগ্ন থাকত। তাছাড়া অনেকদিন ধরে তারা এ চিন্তায় মগ্ন ছিল, কুবা মসজিদের মতো অন্য আর একটি মসজিদ এ বাহানায় তৈরি করা প্রয়োজন। যারা দুর্বল অথবা অন্য কোনো কারণে কুবার মসজিদে বা মসজিদের নববীতে যেতে না পারে, তারা এখানে এসে সালাত পড়বে। এ উসিলায় তাদের গোপন ষড়যন্ত্রের একটি কেন্দ্র তৈরি হবে। আবু আমের রাহেব নামক ধর্মত্যাগী ও মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের ভিত্তিতে তাবুক অভিযানের পূর্বে কুবার মসজিদের কাছেই মুনাফিকরা একটি মসজিদ তৈরি করে। কুরআন মাজীদে একে মসজিদে যিরার বলা হয়েছে। প্রকাশ্যে তা মসজিদ ছিল, আসলে ছিল মুনাফিকদের একটি ষড়যন্ত্র ঘাঁটি। তাবুক থেকে ফিরে রাসূলুল্লাহ (সা.) যিয়াওয়ানে পৌছলে আল্লাহ তায়ালা এ মসজিদ প্রতিষ্ঠায় মুনাফিকদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। তিনি মালিক ইবনে দাখশাম ও মান ইবনে আদীকে আদেশ করেন, "যাও, মুনাফিকদের নবপ্রতিষ্ঠিত মসজিদটি জ্বালিয়ে ধংস করে দাও।" তৎক্ষণাৎ তাঁরা সে আদেশ পালন করেন। এভাবে তা ধংস হয়ে যায়।

তাবুক অভিযান থেকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) ফিরে আসার পর নবম হিজরীর যিলকদের শেষ বা যিলহজ্জের প্রথম দিকে মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা)-এর নেতৃত্বে তিনশ' হাজীর একটি দল হজ্জ সমাপনের জন্য প্রেরণ করেন। হযরত

আলী (রা)-কে ঘোষণাকারী নকীব-এর দায়িত্ব দেয়া হয। কুরআন হাকীমে সে দিনের হজ্জকে 'হজ্জে আকবর' বলা হয়েছে। কেননা এ হজ্জই ইবরাহীম (আ)-এর অনুসৃত নীতির ওপর অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং অন্ধকার যুগের সমস্ত রীতিনীতি রহিত হয়ে যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	তাবুক ও মুতার যুদ্ধের একটি ছক অংকন করুন।

তাবুক ও মুতার যুদ্ধ কোন্ কোন্ নগরীতে অনুষ্ঠিত?	এ দুটি যুদ্ধের সেনাপতিদের নাম লিখ।	কোন যুদ্ধে চারজন সাহাবী সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন?	কোন ঘটনায় মসজিদে যিরার প্রতিষ্ঠিত হয়?

সারসংক্ষেপ :

মহানবী (সা.) এর জীবদ্দশায় বড় দুটি গাযওয়াহ হলো মুতার যুদ্ধ ও তাবুক অভিযান। অভিযান দুটিই ছিল মক্কা থেকে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী অঞ্চল সিরিয়ার রোমান শাসকদের বিরুদ্ধে। এর মাধ্যমে আরবের সীমারেখার বাইরে গিয়ে ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলা করার প্রেরণা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়েই অনুমোদিত হয়। একদিকে তাবুক অভিযানে কৌশল অবলম্বন করে শত্রুকে ভয়-ভীতির মধ্যে রাখা হয়েছিল। অন্যদিকে মুতার যুদ্ধে একাধিক মুসলিম সেনাপতির শাহাদাত বরনের ঘটনার মধ্যদিয়ে মুসলিম সেনাবাহিনী যে কোন যুদ্ধ পরিস্থিতি মোকাবেলার প্রশিক্ষণ লাভ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৯

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. হুনাইনের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়?
   (ক) ৬৩০ (খ) ৬২৯
   (গ) ৬২৮ (ঘ) ৬২২

২. হুনাইন ও তাবুকের অভিযান কোন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়?
   (ক) রোমান সাম্রাজ্যে (খ) গ্রীক সাম্রাজ্যে
   (গ) পারস্য সাম্রাজ্যে (ঘ) কোনটিই নয়

৩. কোন যুদ্ধে পর পর তিনজন মুসলিম সেনাপতি শহীদ হয়েছিলেন?
   (ক) হুনাইনের যুদ্ধে (খ) তাবুকের যুদ্ধে (গ) মুতার যুদ্ধে (ঘ) ক ও খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

ফরহাদ একজন দেশপ্রেমিক ও ধার্মিক সৈনিক ছিলেন। তিনি কোন এক অভিযানে সাধারণ সৈনিক হিসেবে যোগ দেন। কিন্তু উক্ত যুদ্ধে প্রধান সেনাপতির মৃত্যু ঘটলে তিনি তাৎক্ষনিকভাবে সে যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে থাকেন। হঠাৎ করে শত্রুদল তাকে ঘেরাও করে একে একে তার হাত দুটো কেটে ফেলে। তখন তিনি তার দেশের পতাকা বুক দিয়ে আঁকড়ে ধরেন। এবং দেশের পতাকা সমুন্নত করে বীরত্বের সাথে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন।

(ক) কত সলে মুতার যুদ্ধ সংগঠিত হয়? ১
(খ) মুতার যুদ্ধে প্রদত্ত মোহাম্মদ (স:) এর উপদেশগুলো লিখুন। ২
(গ) উদ্দীপকের ঘটনাটি কোন মুসলিম সেনাপতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? উক্ত যুদ্ধের বিবরণ দিন। ৩
(ঘ) ' তাবুক যুদ্ধের মাধ্যমে রোমানরা ইসলামের ছায়াতলে আসে'- যুক্তিসহ লিখুন। ৪

পাঠ-৪.১০ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সম্পর্ক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ইহুদিদের সাথে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সম্পর্কের বিষয়ে জানতে পারবেন এবং
- খ্রিস্টানদের সাথে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর চুক্তির বিষয়ে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**ইহুদি, তাওরাত, কাব বিন আশরাফ, বনু কায়নুকা, বনু নযির, বনু কুরায়যা, সেন্ট ক্যাথেরিন, নাজ্জাশি, আবু লুবাবা ও সাদ বিন মুয়াজ**

ইহুদীদের সঙ্গে রাসূল (সা.) এর সম্পর্ক

নবী হিসেবে গ্রহণ ঃ ইহুদিদের তাওরাত কিতাবে মহানবী (সা.) এর আগমন ও অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিবরণ ছিল। তাই ইহুদিরা তাওরাত পাঠ করে আগে থেকেই মদিনায় মহানবী (সা.) এর আগমনের অপেক্ষায় ছিল এবং মক্কায় আবির্ভাব হওয়ার পররই ইহুদিরা তাঁকে মদিনায় আমন্ত্রণ জানায়।

সুসম্পর্ক ঃ ইহুদিদের আমন্ত্রণ, অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পর ইহুদিরা তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানায় এবং মহানবী (সা.) ও আহলে কিতাব হিসেবে তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন।

চুক্তি ঃ মদিনা সনদের মাধ্যমে মহানবী (সা.) জাতি হিসেবে ইহুদিদের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করেন। মদিনা সনদের শর্ত ছিল, ইহুদিরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধ করবে না। এতদভিন্ন আরো বহুবিধ শর্ত ঐ সনদে উল্লেখ ছিল। উহুদের যুদ্ধ পর্যন্ত ইহুদিরা এসব চুক্তি মেনে চলার পর পুনরায় শত্রুতায় মেতে উঠে।

রাসুল (সা.) এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ঃ উহুদ যুদ্ধে পর থেকেই ইহুদিরা মুসলিমদের প্রতি চরম শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে এবং ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে বিভিন্নভাবে বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করে এবং রাসুল (সা.) এর সার্বিক সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। ফলে তারা ষড়যন্ত্র শুরু করে এবং কুরাইশদের নানাভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার ষড়যন্ত্রে প্ররোচিত করে।

প্রকাশ্য শত্রুতা ঃ ইহুদিরা মদিনা সনদের শর্ত ভঙ্গ করে বদর যুদ্ধে মুসলিমদের সহযোগিতা থেকে বিরত থাকে। উপরন্তু যুদ্ধ শেষে ইহুদি নেতা কাব মক্কায় গমন করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ করতে নানা প্রকারে কুরাইশদের উসকানি দিতে থাকে। নিহত নেতাদের মর্সিয়া পাঠ করে সে কুরাইশদের মাঝে যুদ্ধের রব তুলে দেয়।

মহানবী (সা.) কে হত্যার ষড়যন্ত্র ঃ ইহুদি বনু কায়নুকা সম্প্রদায় কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের সাথে গোপনে পরামর্শ করে মহানবী (সা.) কে হত্যার চক্রান্ত করে। পরে তাদের এ চক্রান্তের কথা জানাজানি হয়ে যায়।

রাসূল (সা.) এর দৃঢ়তা ঃ ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে মহানবী (সা.) ইহুদিদের মদিনা থেকে বহিষ্কার করেন এবং তাদের একটি গোত্রের বিরুদ্ধে ফৌজদারী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা

ইহুদিরা মদিনায় নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপ্রধান রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে নানাভাবে বিশ্বাসঘাতকতা গ্রহণ করে। যেমন-

কাব বিন আশরাফের ষড়যন্ত্র ঃ উহুদ যুদ্ধের পর কাব বিন আশরাফ সদলবলে মক্কায় গমন করে কুরাইশদের সাথে আলোচনা পর্যালোচনাপূর্বক মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তির প্রাক্কালে কাব ও কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান স্ব-স্ব দল নিয়ে কাবা ঘরের পর্দা ধরে শপথ করে, তারা মুসলিমদের এবং মহানবী (সা.) এর বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্য করবে।

রাসূল (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র ঃ একদা মহানবী (সা.) বনু নাযির গোত্রে গমন করলে তারা গোপনে তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করে। তারা রাসূল (সা.) কে প্রাচীরের পার্শ্বে বসিয়ে উপর থেকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যার হীন ষড়যন্ত্র করে। ইতোমধ্যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহী আসলে তিনি সতর্ক হয়ে উক্ত স্থান ত্যাগ করেন।

ইহুদিদের ঔদ্ধত্য ঃ একদা মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইসহ অন্যরা মহানবী (সা.) কে দূত মারফত খবর পাঠায়, তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন, তারা কিছুতেই তাঁকে মানবে না। মদীনা সনদের চুক্তি মোতাবেক তখন মহানবী (সা.) ইহুদিদের অবরোধ করেন এবং অস্ত্রশস্ত্র সমর্পনপূর্বক তাদের মদিনা ত্যাগের নির্দেশ দেন।

ইহুদিদের মদিনা থেকে বিতাড়নের কারণ

সন্ধির শর্ত ভঙ্গ ঃ ইসলামের গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে মদিনায় ইহুদিরা ঈর্ষান্বিত হয়ে ইসলামের সর্বনাশ করার জন্য মক্কার কুরাইশদের সাথে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এভাবে তারা মদিনা সনদের শর্ত ভঙ্গ করে। তাই রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদের মদিনা থেকে বিতাড়ন করেন।

বিভেদ সৃষ্টি ঃ নানা প্রকারের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিখ্যাত আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে মদিনার ইহুদিরা বিভিন্ন ধরনের ফায়দা হাসিলের চেষ্টা চালায়। ফলে মদিনায় অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কায় মহানবী (সা.) তাদের বিতাড়িত করেন।

সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত ঃ মহানবী (সা.) এর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তারা মদিনায় নানা ধরনের নাশকতামূলক কাজ চালাতে থাকে বিধায় মদিনার সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে থাকে। এরই প্রেক্ষিতে মহানবী (সা.) তাদের মদিনা থেকে বিতাড়িত করতে বাধ্য হন।

বনু কায়নুকা গোত্রের বিতাড়ন ঃ ইহুদি বনু কায়নুকা গোত্র প্রথম মদিনা সনদ ভঙ্গ করে। তারা নানা ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অপরাধে রাসুল (সা.) তাদের মদিনা থেকে বিতাড়িত করেন। ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষায় তিনি এ ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হন।

বনু নযির গোত্রের বিতাড়ন ঃ বনু নযির গোত্র মহানবী (সা.) কে হত্যার ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত ছিল। তাদের এ অপতৎপরতা অপকর্মের শাস্তি স্বরূপ মহানবী (সা.) তাদের মদিনা থেকে বিতাড়নের নির্দেশ প্রদান করেন, কিন্তু তারা এ আদেশ অমান্য করে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের প্রস্তুতি নেয়। পরবর্তীতে এক খণ্ড যুদ্ধে তারা পরাজিত হয়ে মদিনা ত্যাগে বাধ্য হয়।

বনু কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতা ফল

খন্দক যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) ঘরে পৌঁছতে না পৌঁছাতে জিবরাঈল (আ.) এসে তাঁকে বললেন, আল্লাহর নির্দেশ, এখনি বনু কুরায়যার মহল্লা অবরোধ করতে হবে। মহানবী (সা.) সাহাবাদের বনু কুরায়যার মহল্লা অবরোধের উদ্দেশ্যে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন।

অবরোধ ঃ বনু কুরায়যা গোত্র তাদের দুর্গের ফটক বন্ধ করে দিলে মুসলিম বাহিনী দুর্গ অবরোধ করে। একাদিক্রমে অনেকদিন অবরোধ চলল। শত্রুরা দুর্গ থেকে বের হলো না, সন্ধি প্রস্তাবও দিল না, তাই অবরোধ দীর্ঘ হতে হলো। অবশেষে তারা চিন্তিত হয়ে পড়ল, এভাবে থাকলে হয়ত তাদের শুকিয়ে মরতে হবে। তারা আওস গোত্রের আবু লুবাবার সঙ্গে পরামর্শক্রমে আত্মসমর্পনের কথা ভাবল এবং পত্রযোগে জানাল, তারা আওস গোত্রের সাদ বিন মুয়াযের ফয়সালা মানতে রাজি। মহানবী (সা.) ও এ প্রস্তাবে রাযি হন।

বিচার ঃ যথাসময় সাদ বিন মুয়ায (রা) ফয়সালায় বসেন। ইহুদিরা ভেবেছিল, বনু কায়নুকা যেভাবে রক্ষা পেয়েছে তারাও সেভাবে রক্ষা পাবে। অনেকে হযরত সাদ (রা.) কে অনুরূপ করার জন্য অনুরোধও জানায়, কিন্তু তিনি ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতের বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করেন। তিনি আদেশ দেন, "পুরুষ যোদ্ধাদের হত্যা এবং নারী ও শিশুদের দাস-দাসীতে পরিণত করা হবে।"

সত্য-বাস্তবতা ঃ পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে এ ঘটনা ঘটে। অন্যান্য ইহুদী গোত্রের ন্যায় বনু কুরায়যাও মুসলিমদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তারা মদিনা সনদের শর্ত লঙ্ঘন করে শত্রুপক্ষে যোগ দেয়। মদিনার মহিলাদের যে দুর্গে রাখা হয়েছিল সে দুর্গে হামলা চালায়। তাদের বিশ্বাসঘাতকার জন্য মদিনায় যে কোনো অঘটনা ঘটে যেতে পারত। এজন্য তাদের আর মদিনায় বসবাস করতে দেয়া বাঞ্ছনীয় ছিল না। কৃত অপকর্মের জন্য সাদ বিন মুয়ায (রা.) কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তিই তাদের প্রাপ্য ছিল। তাদের ওপর প্রদত্ত দণ্ড কঠোর হলেও তৎকালীন সামরিক পরিস্থিতির কারণে তা যুক্তিযুক্ত ছিল। বিশেষ করে তাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতের বিধান অনুযায়ী শাস্তি প্রদত্ত হওয়ায় কিছু বলারও ছিল না।

খ্রিস্টানদের সাথে সম্পর্ক

ইসলামের প্রাথমিক যুগে খ্রিস্টানদের সাথে মুসলিমদের সুসম্পর্ক ছিল। মক্কার কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হযরত ওসমান (রা.) এর নেতৃত্বে একদল মুসলিম আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন এবং সেখানকার খ্রিস্টান রাজা নাজ্জাশি তাঁদের আশ্রয় দেন। মদিনায় হিজরত করার পর সেখানকার খ্রিস্টানরাও মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করতো। তাই হযরত মুহাম্মদ (সা.) এ বন্ধুত্বসুলভ আচরণের কথা স্মরণ করে ষষ্ঠ হিজরীতে সিনাই পবর্তের নিকটবর্তী সেন্ট ক্যাথেরিন নামক এক গির্জার পাদরি ও অন্যান্য খ্রিস্টানদের সাথে একটি সনদ সম্পাদন করেন। এ সনদ খ্রিস্টানদের প্রতি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সহনশীল নীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

চুক্তির শর্তসমূহ

১. খ্রিস্টানদের ওপর কোনো কর ধার্য করা হবে না।
২. কোনো খ্রিস্টান ধর্মজাযককে গির্জা থেকে বহিস্কার করা হবে না।
৩. কোনো খ্রিস্টানকে তার ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে না।
৪. খ্রিস্টানদের কোনো গির্জা ভেঙ্গে সেখানে মসজিদ নির্মান করা হবে না।
৫. গির্জা মেরামত করার জন্য খ্রিস্টানরা মুসলিমদের সাহায্য প্রার্থনা করলে তারা তাদের সাহায্য করবে।
৬. আরবের বাইরে খ্রিস্টান ও মুসলিমদের সম্পর্কের অবনতি ঘটলে তার জন্য আরব খ্রিস্টানদের দায়ী করা হবে না।

সনদের গুরুত্ব ঃ সংখ্যালঘুদের জানমাল ও ধর্মের নিরাপত্তায় এ সনদ একটি মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এ সনদের গুরুত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, "এ সনদ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অসাধারণ সহিষ্ণুতার একটি কীর্তিস্তম্ভ।"

শিক্ষার্থীর কাজ	মদীনা সনদ মানবজাতির প্রথম লিখিত সংবিধান- ব্যাখ্যা লিখুন।

কোন সনদের মাধ্যমে ইহুদিরা মহানবীর সাথে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়?	কোন গোত্র আবু সুফিয়ানের সাথে পরামর্শ করে মহানবীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে?	বনু কুরাইযার বিচার করেন কোন ব্যাক্তি?	কোন খ্রীস্ট্রান পাদ্রীকে মহানবী নিরাপত্তার সনদ প্রদান করেছিলেন?

সারসংক্ষেপ :

আরবের ইহুদি- খ্রীষ্টান উভয় সম্প্রদায় মহানবী (সা.) এর আগমনের পূর্বে শেষ নবীর অপেক্ষায় ছিল। ঈসা (আ.) কর্তৃক সর্বশেষ নবীর আগমনের বিষয়ে তারা আশাবাদী ছিল যে, তিনি হয়ত তাদের স্ব স্ব বংশ থেকে আগমন করবেন। কিন্তু আরবের কুরাইশ বংশের নবী মুম্মদ (সা.) কে তারা কোনভাবেই মেনে নিতে পারছিল না। তবে মহানবী (সা.) মদীনায় গমনের পর মদীনা সনদের মাধ্যমে ইহুদীসহ সকল গোত্র ও সম্প্রদায়ের সাথে যে সহযোগীতামূলক চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, ইহুদিরা তার স্পষ্টত লংঘন করে। এমনকি তারা মহানবী (সা.)বিভিন্ন সময় হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ধর্মীয় বিদ্বেষ নয়; বরং তাওরাতের বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করেই মদীনার ইহুদিদের বিভিন্ন শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১০

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. প্রথম কিবলা কোনটি?
(ক) কাবা (খ) মদীনা মসজিদ (গ) বায়তুল মুকাদ্দাস (ঘ) বায়তুর দেওয়ান

২. কোন অঞ্চলের খ্রীস্ট্রানদের জন্য মহানবী (সা.) একটি লিখিত সনদ প্রদান করেছিলেন?
(ক) নাজরানের (খ) মদীনার (গ) বসরার (ঘ) সিরিয়ার

৩. কোন্ যুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কারণে বনু কুরাইযাকে মদীনা থেকে বহিস্কার করা হয়?
(ক) মুতার যুদ্ধ (খ) খন্দকের যুদ্ধ (গ) হুনায়ুনের যুদ্ধ (ঘ) বদরের যুদ্ধ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

গোত্র/দলের নাম	বনু নাযির	বনু কাইনুকা	বনু কুরাইযা	নাজরানের খ্রীস্টান
কার্যক্রম	রাসূল (স:) কে হত্যার চেষ্টা	মদীনা সনদের শর্ত ভঙ্গ	খন্দকের যুদ্ধে ষড়যন্ত্র	শান্তিচুক্তি

(ক) ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থের নাম কী ? ১
(খ) বনু নাযির গোত্র কিভাবে মহানবী (সা.) হত্যার চেষ্টা করেছিল? ২
(গ) মহানবী কর্তৃক খ্রীস্টানদের প্রদত্ত শান্তি চুক্তির একটি বিবরণ দিন। ৩
(ঘ) 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় মোহাম্মদ (সা.) ছিলেন একজন অতুলনীয় আদর্শ' উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৪.১১ বিদায় হজ্জের ভাষণ ও মুহাম্মদ (সা.) এর শেষ জীবন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিদায় হজ্জ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণ সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- মহানবীর জীবনের অন্তিম মূহুর্তগুলো সম্পর্কে অবিহিত হতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	**বিদায় হজ্জ, ইহরাম, যুল হুলাইফা, আরাফার ময়দান, ও ইতিকাফ বাকী**

বিদায় হজ্জ

মদিনায় দলে দলে বিভিন্ন গোত্রের দূত দল আসতে আরম্ভ করলে হযরত মুহাম্মদ (সা.) বুঝতে পারেন, তাঁর জীবনের মহান কর্তব্য শেষ হয়েছে এবং তাঁর জীবন প্রদীপ ফুরিয়ে আসছে। তাই শেষ হজ্জ বা 'হাজ্জাতুল বিদা' (বিদায় হজ্জ) পালনের উদ্দেশ্যে ১৫ যিলকদ, ১০ হিজরী, ১৩ জানুয়ারি ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে তিনি এক লক্ষের অধিক সাহাবী সহকারে মক্কার পথে রওয়ানা হন। ৬৩১ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে সূরা বারায়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি আরবের সকল গোত্রকে ইসলাম গ্রহণের জন্য চার মাস সময় প্রদান করে বলেন, এ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন না। এর ফলে পর বছর ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (সা.) হজ্জ উপলক্ষে লক্ষাধিক মুসলিমসহ মক্কায় গমন করতে সক্ষম হন। বিদায় হজ্জ পালনে হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সহধর্মিণীদের সঙ্গে নিয়ে যান। এ সময় কুরবানির জন্য তাঁর সাথে ১০০ উট ছিল।

যাত্রার ১৫ দিন পর হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কার ৬ মাইল দূরে 'যুল হুলাইফা' নামক স্থানে পৌঁছেন এবং সেখান থেকে হজ্জের পোশাক বা ইহরাম পরিধান করে মক্কায় প্রবেশ করেন। কাবা গৃহের চতুর্দিকে সাত বার প্রদক্ষিণ করে তিনি মাকামে ইবরাহীম নামক স্থানে সালাত আদায় করেন। সাফা এবং মারওয়া পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে সাত বার দৌড়ান। যিলহজ্জের অষ্টম দিনে আরাফার ময়দানে পৌঁছেন। হজ্জ সম্পন্ন করে আল্লাহর রাসূল (রা.) আরাফাতের জাবালে রহমত পর্বত শিখরে দাঁড়িয়ে উপস্থিত মুসলিমদের উদ্দেশ্যে এক অবিস্মরণীয় ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর এ শেষ উপদেশমূলক ভাষণ মুসলিমদের হৃদয়ে চির সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে। বিদায় হজ্জের ভাষণকে ইতিহাসে প্রধান মানবাধিকার সনদ বলে অনেকে মন্তব্য করেন।

বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণ

- রাসূলুল্লাহ (সা.) ভাষণের শুরুতে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে বিশ্ব-প্রতিপালক সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সমবেত জনসমুদ্রের উদ্দেশ্যে বলেন-
- হে মুসলিমগণ! মনোযোগ সহকারে আমার কথা শোন। কারণ আবার তোমাদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ আল্লাহ আমাকে নাও দিতে পারেন। এ দিন, এ মাস, সকলের জন্য যেরূপ পবিত্র, সেরূপ তোমাদের জীবন ও সম্পদ মহা প্রভুর সাথে সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত পরস্পরের নিকট পবিত্র ও হস্তক্ষেপের অনুপযুক্ত।
- স্মরণ রেখো, দুনিয়ার প্রত্যেক কাজের জন্য একদিন আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে।

- হে প্রিয় সাহাবীগণ! তোমাদের সহধর্মিণীদের ওপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে, তোমাদের ওপরও তাদের তেমন অধিকার রয়েছে। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে তোমরা তাদের গ্রহণ করেছে এবং তাঁরই আদেশমত তাদের তোমাদের জন্য বৈধ করে নিয়েছে। সুতরাং তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে।
- সর্বদা অন্যের আমানত হিফাযত করবে এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে।
- আজ থেকে সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধ। ঋণগ্রহীতা থেকে কেবল আসল অর্থ ফেরত নেবে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরব জাতির 'খুনকা বদলা খুন' নীতি এখন থেকে নিষিদ্ধ হলো।
- দাস-দাসীদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করবে। তোমরা যা আহার কর, যে বস্ত্র পরিধান কর, তাদের অনুরূপ খাদ্য-বস্ত্র দান করবে। তারা যদি ক্ষমার অযোগ্য কোনো আচরণ করে, তা হলেও তাদের মুক্তি দান করবে। স্মরণ রেখো, তারা আল্লাহর সৃষ্টি এবং তোমাদেরই মতো মানুষ।
- তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার করো না, অন্যের দ্রব্য আত্মসাৎ ও অন্যায়ভাবে নরহত্যা করো না এবং কখনো ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ো না।
- হে মুসলিমগণ! আমার কথা মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করতে চেষ্টা কর। স্মরণ রেখো, মুসলিমগণ পরস্পর ভাই ভাই এবং সমগ্র দুনিয়ার মুসলিম একই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে, একই অবিচ্ছেদ্য জাতিসত্তায় আবদ্ধ। অনুমতি ব্যতীত কেউ কারো কোনো জিনিস জোর করে নিতে পারবে না।
- স্মরণ রেখো, অঞ্চল ও বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলিম সমান। আজ থেকে বংশগত কৌলীণ্য প্রথা বিলুপ্ত হলো। সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে কুলীন, যে স্বীয় কর্মে বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে আগ্রহী।
- পথপ্রদর্শক হিসেবে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর কালাম (কুরআন মাজীদ) ও তাঁর প্রেরিত সত্যবাহক রাসূলের চরিত্রাদর্শ (হাদীস) রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এ দুটির অনুশাসন মেনে চলবে ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না।
- হে আমার উম্মতগণ, যারা এখানে সমবেত হয়েছ, তারা অনুপস্থিত মুসলিমদের কাছে আমার কথা পৌঁছে দেবে। যারা অনুপস্থিত তাদের আমার উপদেশের কথা জানাবে। কখনো কখনো উপস্থিত ব্যক্তিদের চেয়ে অনুপস্থিত ব্যক্তিরা অধিক স্মরণ রাখতে সক্ষম হয়।
- নবী করীম (সা.) ভাষণ শেষে উর্ধ্বে হাত তুলে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বললেন, "হে প্রভু! আমি কি আপনার বাণী সঠিকভাবে জনগণের মধ্যে পৌঁছাতে পেরেছি?" উপস্থিত উম্মতগণ গগনভেদী আওয়ায করে বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয় পেরেছেন।' সে সময়, তিনি আল্লাহর কাছ থেকে ওয়াহী লাভ করেন।"(হে মুহাম্মদ), আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের জীবনব্যবস্থা পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নেয়ামতও পূর্ণ করলাম, আর ইসলামকে তোমাদের জন্য জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম। (সূরা মায়িদা) পরিশেষে হযরত (সা.) আবেগজড়িত কণ্ঠে সমবেত জনগণকে লক্ষ্য করে বললেন, "তোমরা সাক্ষী, আমি আমার কর্তব্য পালন করছি। বিদায়! আল-বিদা।"

ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর জীবনসায়াহ্নে হজ্জ উপলক্ষে আরাফাত ময়দানে যে অভিভাষণ প্রদান করেছিলেন, ইসলাম ও মানবতার ইতিহাসে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ বাণীতেই ইসলামী রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ও মানব অধিকারের মূলনীতি বিঘোষিত হয়েছে। এতে মানব জীবনের আধ্যাত্মিক ও বাস্তব উভয় শিক্ষাই বর্তমান রয়েছে। এ শিক্ষা মানব জাতিকে সত্যিকারের মুক্তি ও শান্তির সন্ধান দিয়েছে। মহানবী (সা.)–এর ভাষণের সকল দিক বাস্তবায়িত হলে আজকের এ সংঘাতময় মানব জীবন সর্বাত্মক সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠবে।

মানব জাতির ইতিহাসে বিদায় হজ্জের ভাষণ মানবাধিকারের একটি বিশ্বস্ত দলিল হিসেবে স্বীকৃত। এ ভাষণের তাৎপর্য ইসলামের ইতিহাসে প্রোজ্বল ভূমিকায় দেদীপ্যমান। ঐতিহাসিক আমীর আলীর ভাষায়, মহানবী (সা.)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণ সর্বদিক দিয়েই তাৎপর্যবহ। এ ভাষণ ছিল বাগ্মিতাপূর্ণ ও উৎসাহ উদ্দীপক। সত্য-সুন্দর, কল্যাণ, আনন্দ, সাম্য, ন্যায় ও মানবতার মঙ্গল সাধন এবং অন্যায় দুষ্কৃতি থেকে বেঁচে থেকে সতর্ক সাবধান জীবনাচরণের জন্য মহানবী (সা.)-এর

বিদায় হজ্জের ভাষণ এক গুরুত্বপূর্ণ দলীল। এ ভাষণে বিশ্বপ্রভু মহান আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্ব ঘোষিত হয়েছে এবং সাথে সাথে ঘোষিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-ই সর্বশেষ নবী, তাঁর পরে আর কোনো নবীর আবির্ভাব ঘটবে না। নারী সমাজের প্রতি সহৃদয ব্যবহার ও সম্মানজনক আচরণ, সর্বোপরি নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রশ্নে সচেতন হওয়ার জন্য সবাইকে মহানবী (সা.) এ ভাষণে উপদেশ দিয়েছেন। এ ভাষণে রাসূলুল্লাহ (সা.) দাস-দাসীর প্রতি সদয় মানবোচিত সদ্ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন। অধীনস্থদের অপমান নির্যাতন থেকে মুক্তি দিয়ে শান্তিতে রাখার কথা অত্যন্ত সুন্দরভাবে উল্লেখ করা হয়েছে বিদায় হজ্জের ভাষণে।

অন্তিম যাত্রার আয়োজন

হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মুহাম্মদ (সা.) উহুদ প্রান্তরে শহীদদের সমাধি প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে তাঁদের জন্য প্রাণভরে দোয়া করেন। মদিনায় আগমন করে তিনি 'মাকবারায়ে বাকী' বা বাকী কবরস্থানে উপস্থিত হয়ে দোয়া করেন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সফর মাসের শেষার্ধের প্রথম ভাগে তাঁর শিরপীড়ার সূত্রপাত হয়। ইন্তেকালের পাঁচ দিন পূর্বে তাঁর পীড়া বৃদ্ধি পায়। ঐ দিন রোগযন্ত্রণায় অস্থির অবস্থায় তিনি সমবেত নর-নারীকে সম্বোধন করে বলেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ তাদের পরলোকগত নবী ও আলেমদের কবরগুলোকে উপাসনা মন্দিরে পরিণত করেছে। সাবধান! তোমরা যেন এ মহাপাপে লিপ্ত না হও। খ্রিস্টান ও ইহুদিরা এ পাপে অভিশপ্ত হয়েছে। সাবধান, আমার কবরকে তোমরা সিজ্‌দারস্থল বানিও না।" পীড়ার একাদশ দিবসে তিনি আবু বকর (রা)-কে ইশারায় সালাতের ইমামতি করার আদেশ দেন। এমন সময় একটু আরামবোধ করলে ফযল ও আলী (রা)-এর স্কন্ধে ভর করে তিনি মসজিদে প্রবেশ করেন এবং আবু বাকরের পাশে বসে সালাত আদায় করেন।

সালাতের পর উপস্থিত মুসল্লিদের সম্বোধন করে বললেন, "মুসলিমগণ! আমি তোমাদের আল্লাহর হাতে সমর্পণ করে যাচ্ছি। তাঁর আশ্রয়, তাঁর দান এবং তাঁর সাহায্যে তোমাদের সোপর্দ করে দিচ্ছি। আমার পরেও আল্লাহই তোমাদের রক্ষা করবেন। তোমরা নিষ্ঠা, ভক্তি ও সততার সাথে তাঁর আদেশ পালন করতে থেকো, তাহলে তিনি তোমাদের রক্ষা করবেন, এ আমার শেষ কথা, ভ্রাতৃবর্গ, এই শেষ।"

ইহলোকের শেষ দিন

সাহাবীগণ প্রত্যুষে উঠে ফজরের জামায়াতে সমবেত হয়েছেন। সালাত আরম্ভ হলো। এমন সময় মহানবী (সা.)-এর মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আল্লাহর প্রিয়তম বান্দারা কীভাবে ইবাদতে মগ্ন আছে তা দেখার জন্য তিনি জানালার কাছে গেলেন। সাহাবাদের সালাত আদায়ের স্বর্গীয় দৃশ্য দর্শন করে তিনি অতিশয় আনন্দিত হন। তাঁর মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে। এ সময় তিনি ব্যাথায় অস্থির হয়ে পড়েন।

আয়েশা (রা) বলেন, "(সে দিন) আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা) আসেন, তাঁর হাতে মিসওয়াক ছিল। সে সময় মহানবী (সা.) হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। আমি দেখলাম তিনি বারবার আবদুর রহমান বিন আবু বকরের হাতে থাকা মিসওয়াকের দিকে লক্ষ্য করছেন। তাঁর ইচ্ছা বুঝতে পেরে আমি মিসওয়াক চিবিয়ে দিলে তিনি তা ধীরে ধীরে কয়েকবার দাঁতে বুলান। এরপর পানি দ্বারা মুখ পরিষ্কার করেন।" এরপর অন্তিম অবস্থা উপনীত হন। তিনি বারবার অচেতন হয়ে পড়েন, প্রত্যেক বার চৈতন্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠছেন, "হে আল্লাহ! হে আমার পরম বন্ধু! হে আমার পরম সুহৃদ! আমাকে তোমার সাথে মিলিত কর।" যখন মৃত্যুর সব লক্ষণই দেখা দিয়েছে এমন সময় তিনি শেষবার চোখ মেলে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন- 'সালাত, সালাত, সাবধান! দাস-দাসীদের প্রতি সাবধান। অতঃপর তাঁর আত্মা পরম সুহৃদের সন্নিধানে মহাপ্রস্থান করে। (*ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন*।) (বুখারী, মুসলিম)

শিক্ষার্থীর কাজ	বিদায় হজ্জের ভাষনে মানবাধিকারের দিকগুলো ব্যাখ্যা করুন।

স্বামী-স্ত্রীর মর্যাদা কী রকম হবে বলে ঘোষণা করা হয়?	দাস-দাসীদের খাওয়া পরার বিষয়টি কী রকম?	মানুষের কর্মের হিসাব কার কাছে দিতে হবে?	মানুষের জীবন ও সম্পদ কোন বিষয়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে?

সারসংক্ষেপ :

মহানবী (সা.)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণ মুসলিম উম্মাহর সর্বযুগের জন্য পথ-প্রদর্শক। এ ভাষণ জাহিলী চিন্তা চেতনা ও কুসংস্কার থেকে আরববাসীসহ অনাগতকালের সকল মানুষের জন্য মানবাধিকারের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এ ভাষণের মাধ্যমে মহানবী (সা.) ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সমাজনীতি, পরিবারিক ব্যবস্থাপনা ও ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার এক অনবদ্য দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। বিদায় হজ্জের ভাষনের মতাদর্শ বাস্তবায়ন করা হলে সংঘাতময় বিশ্বের অবশ্যই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আরাফাতের কোন পাহাড়ের চূড়ায় মহানবী (সা.) ভাষন দিয়েছিলেন?
(ক) জাবালে রাহমাত (খ) জাবালে আরাফাহ
(গ) জাবালে নুর (ঘ) জাবালে হেরা

২. মহানবী (সা.) অসুস্থ থাকাবস্থায় কাকে সালাতের ইমামতির দায়িত্ব দিয়েছিলেন ?
(ক) আলী (রা:) (খ) উমর (রা:)
(গ) উসমান (রা:) (ঘ) আবুবকর (রা:)

৩. বিদায় হজ্জের অমূল্য ভাষণে হযরত মুহাম্মদ (সা.) আহবান জানান-
i. ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার
ii. বংশগত কৌলীণ্য প্রথা বিলুপ্ত করার
iii. শ্রেণিবৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও iii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

মিজান মোল্লা একজন মানবাধিকার কর্মী। তিনি একজন সুশিক্ষিত ও ধার্মিক ব্যক্তি। মানবাধিকার সংক্রান্ত গবেষণা করতে গিয়ে পৃথিবীর সকল ধর্মের মানবাধিকার সম্পর্কে তার অনেক ভাল জ্ঞান রয়েছে। "যুগে যুগে মানবাধিকার ও তার বাস্তবায়ন" শীর্ষক সেমিনারে বক্তৃতা কালে মিজান মোল্লা বলেন, বিশ্বে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বশ্রেষ্ট।" তিনি মানবাধিকার রক্ষায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর গৃহিত সকল পদক্ষেপসমূহ তুলে ধরেন। তিনি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকলকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণকে অনুধাবন ও অনুসরণ করার আহ্বান জানান।

(ক) বিদায় হজ্জ কত সালে হয়? ১

(খ) বিদায় হজ্জকে বিদায় হজ্জ বলা হয় কেন? ২

(গ) উদ্দীপকের আলোকে বিদায় হজ্জের ভাষণে প্রদত্ত ইয়াতীম ও দাস-দাসীর অধিকারসমূহ তুলে ধর। ৩

(ঘ) "মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ।"- ব্যাখ্যা কর। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১	: ১. (ঘ)	২. (গ)	৩. (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২	: ১. (গ)	২. (ঘ)	৩. (ক)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩	: ১. (খ)	২. (খ)	৩. (গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪	: ১. (খ)	২. (গ)	৩. (গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫	: ১. (ঘ)	২. (ক)	৩. (গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৬	: ১. (ঘ)	২. (ঘ)	৩. (ঘ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৭	: ১. (ঘ)	২. (খ)	৩. (খ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৮	: ১. (ঘ)	২. (ঘ)	৩. (ক)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৯	: ১. (ক)	২. (ক)	৩. (গ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১০	: ১. (গ)	২. (ক)	৩. (খ)
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১১	: ১. (ঘ)	২. (ক)	৩. (ঘ)